ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম : ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ।। ১৩ চৈত্র, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৮ মার্চ ২০১১ ।। Website : www.eswastika.com

পিঠে ছুরি মারতে প্রস্তুত দুই জোট-শরিক

গূঢ়পুরুষ।। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন তাঁর দল একাই এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার দুই তৃতীয়াংশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। রাজ্য বিধানসভার মোট আসন ২৯৪ টি। নেত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী মানলে তৃণমূল এককভাবে ১৯৬-২০০ টি আসন পাচ্ছে। এরপর তাঁর দিল্লির বন্ধু সরকারের বড় শরিক কংগ্রেস রাজ্যে পরিবর্তনের তথাকথিত মমতা ঝড়ে পাল তুলে নির্বাচনের দরিয়া পার হবে আরও ৫০টি আসন জিতে। অর্থাৎ নেত্রীর কথা মানলে, রাজ্যের প্রধান বিরোধী জোট প্রায় ২৫০টি আসন জিতে ২০১১ সালে মহাকরণ দখল করছে। ভাল কথা। পশ্চিমবঙ্গে টানা ৩৫ বছরের বাম অপশাসনের অবসান পার্টির দলদাসরা ছাড়া সকলেই চায়। যে গণতন্ত্রে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হয় না তাকে সংসদীয় গণতন্ত্র বলে না। যেমন চীনের গণতন্ত্রে এক দলীয় শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হয় না। এমন শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র নয়, দলতন্ত্র বলে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ছলে বলে কৌশলে এমনই এক দলতন্ত্র কায়েম করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সেই দলতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তবে তাঁকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। দলদাসদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষই চাইবেন।

প্রশ্নটা উঠছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার নির্বাচনে শুধুই জয় নয়, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মহাকরণ দখল করার যে স্বপ্ন দেখছেন তা কতটা বাস্তব? একটু খতিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা নেই যে এই রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের একটা চোরা স্রোত আছে। বিগত দশ বছর ধরেই সেই স্রোত বয়ে চলেছে। এবার তা প্রবল হয়ে বইছে। তবে এতটা প্রবল নয় যে সারা রাজ্যজুড়ে বাম প্রার্থীরা সেই স্রোতে

খড়কুটোর মতো ভেসে যাবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যাবে বামপন্থীদের, বিশেষত সি পি এম দলের, সাংগঠনিক দলীয় কাঠামো অটুট আছে। দলের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও ক্ষমতা হারানোর ভয় এবার বাম শিবিরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। অতীতে নির্বাচনের সময় বামফ্রন্টের শরিকরা আসন রফা, প্রার্থী মনোনয়ন ইত্যাদি নিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছে। সি পি আই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব এবার প্রকাশ্যে আসন রফা নিয়ে কোনও রকম বিতর্কে যাননি। তাঁরা ভোটদাতাদের কাছে ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় সংকল্প এক বামফ্রন্টকে দেখাতে চেয়েছেন। এতে সাধারণ ভোটদাতারা কতটা প্রভাবিত হবেন বলা যায় না। তবে দলের কর্মীরা যে যথেষ্ট উৎসাহিত হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দলদাসরা সর্বশক্তি নিয়ে নির্বাচনী দরিয়ায় স্রোতের বিরুদ্ধে শক্তহাতে নৌকার হাল ধরবে। দাঁড় বাইবে। বামপন্থী সব নৌকাই নিরাপদে বন্দরে হয়তো ফিরতে পারবে না। তবে একথাও মানতে হবে যে সব বাম নৌকার বিপরীত স্রোতে ভরাডুবি হবে এমনটাও নয়। বাস্তবকে অস্বীকার করে দিবাস্বপ্ন দেখাটা বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিচায়ক নয়। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের দুর্বল মনে করাটা ভুল হবে। সি পি এম একটি রেজিমেন্টেড পার্টি। এদের ফুৎকারে উড়িয়ে দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল করবেন।

দ্বিতীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে দিল্লিতে কংগ্রেস এবং তৃণমূল বন্ধু হলেও পশ্চিমবঙ্গে পরস্পর পরস্পরের শত্রু। এই রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা ভালভাবেই জানেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলে জেলায় জেলায় কংগ্রেস অফিসে তালা ঝুলবে। দলের অস্তিত্বই থাকবে না। পুরো দলটাকেই তৃণমূল গিলে ফেলবে। অন্যদিকে, সি পি এম তার দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থেই বশংবদ প্রদেশ কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রাখবে। কম্যুনিস্টদের দলতন্ত্রে অনুগত বিরোধী দলের বিশেষ প্রয়োজন আছে। গত ৩৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সেই ভূমিকা পালন করে চলেছে। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব জানে যে মমতার জয় মানে কংগ্রেসের হার। ছাগ-শিশুর অজগরের পেটে যাওয়া। চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় যে রাজ্য কংগ্রেস তার সর্বশক্তি দিয়ে তৃণমূল প্রার্থীদের হারাতে চাইবে। একই চেষ্টা গোপনে চালাবে তৃণমূল নেতৃত্ব। মমতা চাইবেন না কংগ্রেস বেশি আসনে জিতে ক্ষমতার অলিন্দে পেশী আস্ফালন করুক। পিঠে ছুরি মারার জন্য বিরোধী জোটের দুই শরিকই প্রস্তুত। এমন অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ দলদাস হার্মাদদের প্রতিরোধ তারা কতটা সফলভাবে করতে পারে এখন সেটাই দেখার। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, জুলিয়াস সিজারের মতো মমতা এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন নির্বাচনে এতটা সহজ জয় হবে না।

কংগ্রেসী হস্তক্ষেপে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশের আভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন (সি বি আই)-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেল। সরকারী হস্তক্ষেপই যে এই গ্রহণযোগ্যতাকে একেবারে তলানিতে ঠেকিয়ে দিয়েছে সে নিয়েও নিঃসন্দেহ বিশেষজ্ঞরা। গত বছরের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে যান সিবিআই ডিরেক্টর অমর প্রতাপ সিং। তিনি অভিযোগ করেন— টেলিকম্ মন্ত্রী এ. রাজার বিরুদ্ধে তদন্তের গতি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শ্লথ করে দিচ্ছে সরকারপক্ষ। সিং আরও জানান, তদন্তের সুষ্ঠু সমাধানের স্বার্থে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তবে শ্রী সিং এনিয়ে একটি প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছিলেন যে, যদি তাঁরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া তদন্ত করতে পারেন তবে জনগণ কিন্তু আবার সিবিআইয়ের ওপর আস্থা ফিরে পাবেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে, অচিরেই সিবিআই-এর পক্ষে জনগণের আস্থা ফিরে পাওয়া মুশকিল। কারণ কংগ্রেসী আমলে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি দায়বদ্ধতা দেখানোর চেয়ে শাসকদলের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনেই বেশি মনযোগী হয়েছে তারা। সাম্প্রতিক- কালে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইয়ের অধীন কয়েকটি হাই-প্রোফাইল মামলায় নজরদারি করতে চেয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এই ব্যাপারটা সিবিআই-এর পক্ষে শাপে বর হতে পারে; হৃত গ্রহণযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করতে সহায়ক হতে পারে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে সারা দেশে সিবিআই-এর হাতে ৮৫৯টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০৯ জন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে সিবিআই তাদের তদন্ত শেষ করতে পেরেছে। যদিও এদের শাস্তিদানের বিষয়টি

এ রাজা

অমর প্রতাপ সিং

এখনও ঝুলে রয়েছে। এনিয়ে সর্বভারতীয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'ইন্ডিয়া টুডে' তথ্য জানার অধিকার আইনের বলে জানতে পেরেছে সিবিআই ২০০৮-এর ডিসেম্বর থেকে ২০০৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরে ২৩ জন অতি উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা (মূলতঃ যুগ্ম-সচিব স্তরের)-র বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আনলেও তাদের শাস্তিদানের জন্য কোনও সুপারিশ করেনি। বর্তমানে সিবিআইয়ের ৬৭টি শাখায় সদস্য সংখ্যা ৫,১৭০। মামলার গতি বাড়ানোর জন্য ৭১টি বিশেষ সিবিআই আদালত স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। বিভিন্ন কোর্টে সিবিআইয়ের প্রায় ৯,৯১০টি মামলা এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। সব মিলিয়ে সিবিআই-এর নামকরণ বহুদিনই হয়েছিল কংগ্রেস ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন। এখন কেউ কেউ কোরাপ্ট ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন বলেও ডাকছেন!

কোরাপ্ট ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন নামকরণ হবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। গত ১০ বছরে ২৪ জন সিবিআই আধিকারিকের নামে অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতির। কলকাতার বুকে ৫০,০০০ টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ২০০৮-এ বমাল ধরা পড়েন সিবিআই-এর ডি এস পি পার্থসারথি বোস। ওই একই বছরে একই পরিমাণ অর্থ ঘুষ নিয়ে গ্রেপ্তার হন ইনস্পেক্টর প্রবীণ কুমার। ২০০৭-এ এস পি অজয়কান্ত সহায়-এর নামে মামলা হয়, যদিও তিনি গ্রেপ্তার হননি। ওই বছরই আরেক অভিযুক্ত ইনস্পেক্টর বিনায়ক দুবের নামে মামলা এখনও বিচারাধীন। ২০০৬ থেকে এখনও কেস ঝুলছে সিবিআইয়ের ডেপুটি লিগ্যাল অ্যাডভাইজার আর পি দ্বিবেদী-র নামে। সহকারী

(এরপর ৪ পাতায়)

নবরূপে স্বস্তিকা'র প্রকাশ

হিন্দুত্ব তথা জাতীয় চেতনার প্রচার ও প্রসারে সমর্পিত সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাগুলির বিগত রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে স্থির হয় যে, যত শীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট সাপ্তাহিকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী 'নববর্ষ সংখ্যা ১৪১৮' (১৮ই এপ্রিল - ২০১১) থেকে স্বস্তিকা'র প্রতিটি সংখ্যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। নতুন আঙ্গিকের স্বস্তিকা সুধীজনের কাছে সাদরে গৃহীত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আঙ্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার আলোচ্য বিষয়গুলি আরও আকর্ষণীয় করার প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে।

সকল গ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ীগণের যথোচিত সহায়তায় স্বস্তিকা আগামী দিনে আরও শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই কামনা করি।

— স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

ইমামদের ভাতা প্রদান

এক বৃহন্নলা উপাখ্যান

নটরাজ ভারতী।। ইদানিংকালে বিভিন্ন লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে বৃহন্নলাদের দাপাদাপি বেড়েছে। প্রায় সব ট্রেন এবং সব স্টেশনে এদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। হাততালি দিয়ে টাকা চাইছে। না দিলেই অভিশাপ। মরণ, পরের জন্মে হিজড়ে হবি। কয়েকদিন আগে এক এক্সপ্রেস ট্রেনে একদল বৃহন্নলা চলে যেতেই মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বললেন— বৃহন্নলাদের কি অত্যাচার দেখেছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদর্শন এক যুবক বললো— শুধু ট্রেনের কথা বলছেন কেন কাকু। পার্লামেন্টে বা বিধানসভাতেও তো এখন এদেরই

রোজা-সাপ্টা

দাপাদাপি। পার্লামেন্টে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা তো তাও নিজের ভাল বোঝে। পার্লামেন্টের বৃহন্নলারা তো সেটাও বোঝে না। ইমামদের বেতন বৃদ্ধি মানে যে একটি দেশকে সামগ্রিকভাবে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া সে বোধটুকুও এদের নেই।

বিহারে বহুবার গেছি। সংবাদ সংগ্রহের প্রয়োজনে। কয়েক বছর আগেও শুনতাম 'যবতক সমোসা মেঁ আলু— তবতক বিহার মেঁ লালু'। সবাই শুনেছেন। কিন্তু এখন প্রকৃত অবস্থাটা কি। সিঙাড়াতে আলু এখনও আছে। কিন্তু বিহারে লালু নেই। মৃত্যুর ঠিক আগে দাদু-ঠাকুমারা যেমন হেঁচকি তোলেন লালু তেমন হেঁচকি তুলছেন। বিপন্ন রাজনৈতিক জীবন। তবুও চির-অভ্যাসমতো মুসলিম তোষণে তৎপর। তার দল সোচ্চার ইমামদের বেতন বৃদ্ধিতে। ভাবটা এমন যেমন এদেশের ইমামরা খেতে পান না। ওদের কুড়ি হাজার টাকা মাইনে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মিলে সুর মেরা তুমহারার মতোই লালুর এই সুরে সুর মিলিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা দিদির তৃণমূল। তাঁর দলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইদ্রিস আলিরা। মাও এবং মিঞা— এরাই এখন তৃণমূলের দুই স্তম্ভ। আর সে কারণে ইমামদের সরকারী বেতনের দাবি তুলেছে।

এদের যুক্তি ইমামরা বড় গরীব। অর্থাভাবে ভুগছে। ভাবটা এমন যে ইমামরা ছাড়া ভারতবর্ষে আর কেউ গরীব নেই। মুসলমানদের সম্পর্কে

(এরপর ৪ পাতায়)

ডোবার আগে খড়কুটো ধরে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা সিপিএমের

নিশাকর সোম

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এখন প্রার্থী ঘোষণার পর্যায়। ১৪৯ জন নতুন প্রার্থী নিয়ে বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সিপিএম-রাজ্য নেতৃত্বকে এই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে হিমসিম হতে হয়েছে। সিপিএমের প্রয়াত রাজ্য-সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ১৩৪ জন প্রার্থী পরিবর্তন করেছিলেন। এবারে বিমান বসু-বুদ্ধদেব-মদন ঘোষ অ্যান্ড কোং ১৪৯ জন প্রার্থী পরিবর্তন করেছেন। এখনও শ্রীরামপুর এবং কালিম্পং-এর প্রার্থী ঠিক করতে ব্যর্থ হয়েছে। অসুস্থ-অতিবৃদ্ধ বিদায়ী মন্ত্রী— যিনি লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন তাঁকেও পুনরায় প্রার্থী করতে বাধ্য হয়েছেন সিপিএম-রাজ্য নেতৃত্ব। কারণ, মালদহ জেলা-কমিটির চাপ ছিল। বস্তুত এবারের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্ব জেলা- কমিটির চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বিদায়ী মন্ত্রী মানব মুখার্জি-কে তালিকা থেকে বাদ দেওয়াটা প্রায় নিশ্চিতই ছিল। কারণ বিগত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সিপিএমের প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস মানব মুখার্জিকে প্রযুক্তি মন্ত্রক না-দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলে গিয়েছিলেন যে, ওই দপ্তরটি ডঃ দেবেশ দাশ-কেই যেন দেওয়া হয়। সেইমতো এবারের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সিপিএমের কলকাতা জেলা-কমিটি পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেয় যে, মন্ত্রী মানব মুখার্জিকে মনোনয়ন না দিলেই ভাল হয়। এমতাবস্থায় মানব মুখার্জি দ্রুত নিজেই নির্বাচনে 'না-দাঁড়ানোর' সিদ্ধান্ত করে ফেলেন। সিপিএম-এর রাজ্য-নেতৃত্ব দেখেছেন যেখানেই জেলা-কমিটির মধ্যে প্রার্থী বাছাই নিয়ে গোষ্ঠী-কলহ, সেখানেই হস্তক্ষেপ করে প্রার্থী ঠিক করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা পার্টির সাধারণ-সম্পাদক প্রকাশ কারাতের ঘনিষ্ঠ মদন ঘোষের ভূমিকা ছিল নির্ণায়ক।

তাই নিরুপম সেন-কেও প্রার্থী হয়ে ভোটারদের মুখোমুখি হতে বাধ্য করা হলো। রবীন দেব সম্পর্কে কলকাতা জেলা-কমিটির সিদ্ধান্ত হলো তাঁকে রাজ্য-নেতৃত্বের অংশ-হিসেবে সাংগঠনিক কাজেই রাখা হোক। কলকাতা জেলা-কমিটির স্পষ্ট কথা ছিল মহম্মদ সেলিমকে কোথাও দাঁড় করানো উচিত হবে না। তাই বৃদ্ধ-পরিবার বান্ধব মহম্মদ সেলিমকে মনোনয়ন দেওয়া হলো না। ঠিক তেমনিভাবেই শাসনের মজিদ মাস্টারের মনোনয়ন বাতিল করতে বাধ্য হলেন বিমানবাবুরা, বুদ্ধবাবুর চাপে। সিপিএম রাজ্য-কমিটি প্রধানতঃ জেলা-কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপস করেছে। তবে যারা দুর্নামের ভাগীদার তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। যেখানে দ্বন্দ্ব আছে সেখানে যুবক প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে রাজ্যস্তরে মদন ঘোষ-গৌতম দেবের সাহায্য নিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। কলকাতা জেলা কমিটির চাপে এন্টালিতে ডঃ দেবেশ দাশ-কে প্রার্থী করতে বাধ্য হয়। সেই জন্যই স্পিকার-তনয় ডাঃ ফুয়াদ হালিম-কে বালিগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে। গৌতম দেব দমদমে পার্টিকর্মীদের বলেছেন— "যাঁদের বদনাম আছে তাঁরা অফিসঘরে বসে নির্বাচনী কাজ করবেন— জনগণের সামনে যাবেন না।" নতুন মুখের কর্মীরাই ভোটারদের কাছে যাবেন। এইভাবে আঁটঘাট বেঁধে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট নির্বাচনী লড়াইতে নামছে। এবারের প্রচারের বৈশিষ্ট্য হলো বামফ্রন্ট-কেই সামনে রাখা হবে— সিপিএম-কে সামানাই প্রচারে আনা হবে। জেলাস্তরে বামফ্রন্টকে সক্রিয় করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাঠক হয়ত ভাববেন বামফ্রন্ট সম্বন্ধে এতো কথার দরকার কি? দরকার আছে— নিমজ্জমান সিপিএম ভাসার জন্য খড়কুটোর মতো কৌশলকে ধরে দাঁড়ানোর এক 'ব্যর্থ' প্রয়াস চালাচ্ছে। কারণ ভোটারদের সিপিএম বিরোধী-মনোভাব এখনও তীব্র। তাই সিপিএমের রাজ্য-কমিটির সভায় জেলার রিপোর্টের মূল্যায়নে দেখা গেছে ন্যূনতম ১০০টি আসনে বামফ্রন্টের হারার সম্ভাবনা আছে। যে-সব মন্ত্রীদের বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ এলাকার পার্টি এবং জেলা পার্টি থেকে পাওয়া গেছে। তবে আইনমন্ত্রী রবিলাল মৈত্র-কে নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে তীব্র বিক্ষোভ আছে। রাজ্য-কমিটি বস্তুত সুশান্ত ঘোষ-কে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে— কারণ তিনি দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন। তপন-সুকুর-লক্ষ্মণ শেঠকে মনোনয়ন থেকে বাদ দিয়ে সান্ত্বনা পুরস্কার— তমালিকা পণ্ডা শেঠ-কে প্রার্থী করা হয়েছে। বামফ্রন্টের নির্বাচনী পথ কন্টকাকীর্ণ। প্রতি পদক্ষেপে বিরোধিতার কাঁটা ফুটবে। সাঁইবাড়ি, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই হত্যালীলা সিপিএমকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। তাই বামফ্রন্টের সব শরিক দলের ওপর সিপিএম-এর এতোদিনের 'দাদাগিরি' বন্ধ হয়ে 'ভাই ভাই' ভাব দেখা যাচ্ছে।

অপরপক্ষ অর্থাৎ রাজ্যে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট নিয়ে শেষপর্যন্ত দড়িটানাটানি চলেছিল। শেষমেশ সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশে জোট হয়েছে এবং তৃণমূল নেত্রীর দাক্ষিণ্যে পাওয়া ৬৫টি আসন নিয়েই তৃণমূলের অনুসারী হতে হয়েছে রাজ্য-কংগ্রেস-কে।

প্রার্থী মনোনয়নে তৃণমূল নেত্রী একক নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন— বছরের পর বছর যেসব তৃণমূল কর্মী সিপিএমের হার্মাদদের সঙ্গে লড়াই করে মাটি ধরে রেখেছেন তাঁদের অনেকেই মনোনয়ন পাননি। কারণ যেভাবে 'তারকা'দের তৃণমূল নেত্রীর দাক্ষিণ্যের জন্য লালায়িত তাতে এই সম্ভাবনাটাই দেখা যাচ্ছে। রাজ্য-সরকারের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি 'জনগণের সেবা'র জন্য তৃণমূল-নেত্রীর করুণায় প্রার্থী হয়েছেন। যে চিফ সেক্রেটারি প্রয়াত জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় সকল অপকর্ম (বানতলা সহ)-এর সম্পাদনায় লিপ্ত ছিলেন— জনগণের বিরুদ্ধে, তিনি নাকি আজ 'জনগণের সেবা' করতে চান। কি বিচিত্র এ-দেশ!

তবে যাইহোক, সিপিএম-কে এই অবস্থার সুযোগ দেওয়াটা উচিত হবে না। এইবার মনোনয়ন প্রাপ্তিতে ব্যর্থ 'রথীগণ' বিজেপি শিবিরে আসবেনই। শান্তি-সন্ত্রাস-বিরোধী উন্নয়নমুখী মোর্চা কি গড়ে উঠবে না? কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দুর্নীতির ফাঁসে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী' নির্দেশরূপী কেলেঙ্কারীতে যুক্ত হয়ে সিংহাসন টলমল। ২০১৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কি টিকবে? বিজেপি বলিষ্ঠ বিরোধিতায় বিকল্প হিসাবে কি উঠে আসবে? ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

পরলোকে প্রেমোৎপল বিশ্বাস

প্রেমোৎপল বিশ্বাস গত ১৭ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছে। রেখে গিয়েছেন স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের। গত দুর্গা পুজোর সময়ে কন্যার অকাল মৃত্যুতে যে গভীর শোক তাঁকে গ্রাস করেছিল তা আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। গত ২৩ মার্চ তাঁর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নাতনী স্বস্তিকা দপ্তরে ফোন করে এই সংবাদ দেন। বোলপুরের কাছারীপট্টি নিবাসী প্রেমোৎপলবাবু কর্মজীবনে কোর্টে চাকরী করেছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক যাবৎ তিনি স্বস্তিকার পাঠকদের কাছে 'বিশাখা বিশ্বাস' নামেই সমাদৃত। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী স্বস্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছে দীর্ঘদিন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। স্বস্তিকা- পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাই। তাঁর অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক— ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শুদ্ধির নামে ভণ্ডামি

কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রে একটি সুপরিচিত কাজের পদ্ধতি রহিয়াছে, সেইখানে দলীয় নীতির বিরুদ্ধে দলের ভিতরে ছাড়া প্রকাশ্যে মতানৈক্য জাহির করা গর্হিত অপরাধ। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের অভ্যন্তরে একাধিক মতভেদ থাকিলেও কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকাশ্যে সেই মতবিরোধের প্রশ্ন তোলার সাহস সঞ্চয় করিতে পারেননি। কিন্তু পরিবর্তন যেহেতু প্রকৃতি ও জগতের ধর্ম তাই পরিবর্তনের শঙ্কায় সিপিএম নেতৃত্ব এই পরিবর্তনকে ঠেকাইতে নিজেদের প্রার্থী তালিকায় ৯ মন্ত্রীকে বাদ দিয়াছেন এবং ১৪৯ জন নতুন মুখ আমদানি করিয়াছেন। এবারের প্রার্থী-তালিকা হইতে যে নয়জন মন্ত্রী বাদ পড়িয়াছেন তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়, স্কুল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী বঙ্কিম ঘোষ, অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন মন্ত্রী যোগেশ বর্মণ, জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস প্রমুখ রহিয়াছেন। শোনা গিয়াছে যে এইসব নেতা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতা, অনাচার ঔদ্ধত্য ও দুর্নীতির অভিযোগ রহিয়াছে। এইসব মন্ত্রীদের বাদ দেওয়ার পিছনে উপরোক্ত কারণগুলিই যদি সত্যি হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রার্থীতালিকা হইতে সবচেয়ে প্রথম যে মন্ত্রীর নাম বাদ যাওয়া উচিত ছিল তিনি হইলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাহার পর শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র এবং অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। এই বিচারে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের নামও বাদ দিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

বাম রাজত্বে পার্থবাবু পূর্বেও একবার প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং সেই সময় তিনি প্রাথমিক স্তর হইতে ইংরেজি তুলিয়া দিয়া কয়েক লক্ষ শিশুর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রজন্মটি আজও শিক্ষায় পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে। এজন্য সেইবার তিনি নির্বাচনে পরাজিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু দলটির নাম যেহেতু সিপিএম এইখানে দলীয় স্বার্থ ছাড়া জনগণের স্বার্থ দেখা অসম্ভব। তাই সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারে পুনরায় তাহাকে একই দপ্তরের মহামান্য মন্ত্রী করা হইয়াছিল। আজ প্রাথমিক শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ ৩৫-এ ৩৩ তম। ঝাড়খণ্ডের ঠিক উপরে। প্রাথমিকে শিক্ষক শিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। এইরাজ্যে প্রশিক্ষিত শিক্ষকসংখ্যা বেশ কম। সুযোগ বুঝিয়া শিক্ষা ব্যবসায়ীরা তাই সরকারী আনুকূল্যে জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়াই অনেক প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিটি আই) খুলিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পরে মহামান্য কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় এমন ১২২টি সংস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া শিক্ষার্থীদের প্রতারণা করিবার আয়োজনে দল ও সরকারের যোগসাজস স্পষ্ট করিয়াছেন। নিজ দলের লোকেদের কিছু পাইয়ে দিবার অভিপ্রায়ে প্রায় ১,৭০,০০০ তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়াছেন এই মন্ত্রী। ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করিয়াছে কয়েকজন। গ্রামাঞ্চলে অন্তত ৩৭ শাতাংশ বিদ্যালয়ের গৃহ জীর্ণ। ২২ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানীয় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই ৯১.৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে। মহিলাদের পৃথক শৌচাগার নেই ৮৪ শতাংশে। স্কুল ছুট রোধে ব্যর্থ প্রধান পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে অন্যতম এই রাজ্য।

রাজ্যের কোনও জলনীতি নেই। রাজ্য-সরকার পেপসি-কোককে মাটির নীচ থেকে যথেচ্ছ জল তুলে নেওয়ার অনুমতি দিচ্ছে অথচ মানুষের পানীয় জল দেওয়ার দায় নেই। রাজ্যের ৩৪১ টি ব্লকের মধ্যে ১৩০টির মাটির নীচের জল আর্সেনিক। গত তিন দশকে বৃষ্টির জলের সংরক্ষণের কোনও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। অথচ পাঁচটি বছর বেশ সুখেই দিন কাটাইয়া গেলেন জলসম্পদ মন্ত্রী। নয়জন মন্ত্রীকে অযোগ্যতার বিচারে বাদ দেওয়া হইলেও, অনেক প্রার্থীবদল হইলেও কিন্তু দলের নীতি ও কার্যক্রমের কোনও পরিবর্তন ঘটিতেছে না। দলের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে সবচাইতে অযোগ্য সমালোচিত ব্যক্তিটিই কিন্তু এইবারে নেতৃত্ব দিবেন। অন্যান্য মন্ত্রীরা অযোগ্যতার জন্যে যদি বাদ যাইতে পারেন তবে মুখ্যমন্ত্রী ব্যর্থতার বিচারে বাদ যাইবেন না কেন? মুখ্যমন্ত্রী হইয়া তিনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি করিলেন তাহা নিজেই জানেন না। তাঁর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর অথচ পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্ট সমালোচনায় মুখর। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে তাঁর অভিনবত্ব তিনি হার্মাদ এবং পুলিশের সংযুক্তিকরণ করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন শত দোষী হইলেও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সততার পূজারী তাহাদের জানিয়া রাখার প্রয়োজন আইনের ১৩ (ডি)-ধারায় সল্টলেকে জমি বন্টনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে স্বজন পোষণের মাধ্যমে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রহিয়াছে। এছাড়াও টাটা ও সালিমের সঙ্গে গোপন চুক্তি এবং তাঁহার কন্যার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কোটি কোটি টাকার উৎস লইয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। আর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবস্থা আরও করুণ।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যত তাড়াতাড়ি আমরা কাজ করবো তত তাড়াতাড়ি আমরা উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবো। অতএব কাজের গতি শতগুণ বাড়াতে হবে। লোকে নিন্দা করে করুক। কিন্তু তোমার মন যদি নির্মল থাকে তাহলে নিন্দা বা প্রশংসার দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নেই।

—ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

ধর্মান্তরকরণের অধিকার

ডঃ নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি দারা সিংয়ের মামলায় সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তাতে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে সাংবিধানিক ব্যবস্থাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি বি. এস. চৌহান ও পি. সত্যশিবমকে নিয়ে গঠিত ডিভিশান-বেঞ্চ দারা সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত ওড়িশা হাইকোর্টের রায় বদল করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়ে জানিয়েছে যে, কোনও মামলায় বিচার করতে হয়ে ঘটনা বা বিষয়টার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা দরকার। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারীতে ওড়িশার খৃস্টান যাজক গ্রাহাম স্টেইন্স ও তাঁর দুই পুত্রকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারার অভিযোগে দারা সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উক্ত ডিভিশন বেঞ্চ মনে করে যে, এই ক্ষেত্রে শাস্তিটা একটু লঘু হওয়া উচিত, কারণ এই অন্যায় কাজটার পেছনেও একটা আবেগ কাজ করেছিল এবং সেটা নিন্দনীয় হলেও একেবারে যুক্তিহীন নাও হতে পারে।

সংবিধান অনুসারে কেউ অন্যকে জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করতে পারে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মপ্রচারকরা মানুষের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ধর্মান্তরিত করেন। আদালতের মতে এই ধরনের ঘটনা দারা সিংয়ের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। সুরতরাং তিনি শাস্তিযোগ্য হলেও সেটা চরম দণ্ড হওয়া উচিত নয়— দেখা দরকার এক্ষেত্রে ধর্মান্তরকরণের কাড়াকাড়ি তাঁর মধ্যে বিরুদ্ধতা এনে দিয়েছিল কিনা।

এই রায় থেকে শোনা যায়— শীর্ষ আদালত ওই হত্যাকে গর্হিত অন্যায় বলে মেনে নিলেও ধর্মান্তরকরণকেও সহজে মেনে নিতে চায়নি, এটাকে ন্যায়নীতি ও সাংবিধানিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থাটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।

এই সংবিধানের ২৫ (১) নং অনুচ্ছেদে ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় অধিকার। ধর্ম যাতে রাজনীতিকে প্রভাবিত বা গ্রাস না করে, সেইজন্য আমাদের সংবিধান রাষ্ট্রকে 'সেকুলার' করতে চেয়েছে। বলা হয়েছে— রাষ্ট্রের কোনও নিজস্ব ধর্মমত থাকবে না। কোনও ধর্মমত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে না এবং ধর্মমত হবে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। এক্ষেত্রে তিনটে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে--- সেগুলো হলো 'profess, practice and propagate।' প্রথম কথাটা দ্বারা বোলানো হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছে বা পছন্দমতো যে কোনও ধর্মমত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ধর্ম জিনিষটা নিছক অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়— সব ধর্মমতের সঙ্গেই তার কিছু বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার-অনুষ্ঠান জড়িত আছে। সেই কারণে 'practice' শব্দটাও রাখা হয়েছে যাতে তিনি সেই ধর্মের অনুসারী ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে পারেন।

কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো— এক্ষেত্রে আছে 'propagate' কথাটাও। সুতরাং ব্যক্তি সেই সঙ্গে নিজের ধর্ম প্রচারও করতে পারেন। ডঃ এস. ভি. পাইলী মন্তব্য করেছেন, এই ধরনের অধিকার কিন্তু লিখিতভাবে অন্য কোনও সংবিধানে দেওয়া হয়নি--- 'The word propagate does not find a place in any other constitution'—(অ্যান্ ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১২২)।

অবশ্যই ব্যাপারটা নিয়ে গণপরিষদে বেশ বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। আর. আর. দিবাকর ও এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও বলেছিলেন— এই ধরনের অধিকার দেওয়া হলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার গণ্ডগোল বাধবে। হিন্দু-ভাবাবেগের কথা ভেবে ভীত তাজমূল হোলেনও বলেছিলেন —ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এই ধরনের অধিকার থাকা উচিত নয়। গণপরিষদের বিতর্ক, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৮১৮)। লোকনাথ মিশ্রও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, এর ফলে দেশ আবার ধর্মীয় কারণে বিভক্ত হতে পারে— (ওই, পৃঃ ৮২২)।

কিন্তু কে. শান্তানাম এই অধিকারটা রাখতে চেয়েছেন অন্য কারণে। তাঁর মতে, সংবিধান ১৩ নং (এখন সেটা ১৯ নং) অনুচ্ছেদে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দান করেছে। ধর্মপ্রচার তার মধ্যেই পড়ে। তাছাড়া এই অনুচ্ছেদে (২) নং ধারা আছে--- তাতে বলা হয়েছে, ন্যায়, জন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি রক্ষা করেই এই অধিকার ভোগ করতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রের হাতে প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু রাখা যাবে— (ঐ, পৃঃ ৮৩৪)। অধিকারটা অবাধ হবেই না।

অধিকাংশ সদস্যই তাঁর মুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। এই জন্য ডঃ পঞ্চানন মিশ্র মন্তব্য করেছেন— 'Thus, all the objections were turned down by the House'— (দ্য মেকিং অফ দ্য ইন্ডিয়ান রিপাবলিক, পৃঃ ৮৩)।

প্রশ্ন হলো--- ধর্মপ্রচার (propagate) শব্দটার মধ্যে কি ধর্মান্তকরণ ('convert') আছে? অবশ্য ধর্মপ্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অন্যদের প্রভাবিত করে নিজের ধর্মে টেনে আনা। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, সংবিধান 'convert' কথাটা আদৌ ব্যবহার করেনি— কারণ একজন অন্যকে ধর্মান্তরিত করার অধিকার পেলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকেও ধর্মান্তরিত করার দাবি করতে পারেন। সেই জন্য শীর্ষ আদালত মন্তব্য করেছে— কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভীতি বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা যাবে না— (স্টেইলিস্লস্ বনাম মধ্যপ্রদেশ, ১৯৭৭)। সুতরাং বলা যায়--- ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ বা প্রলোভন আমাদের সংবিধান অনুসারে নিষিদ্ধ ব্যাপার— (ডঃ সুভাষ কাশ্যপ— আওয়ার কন্স্টিটিউশান, পৃঃ ১২২)। দুর্গাদাস বসু সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন— ধর্মান্তরকরণের অধিকার সংবিধানে উল্লেখ করা হয়নি। ধর্মান্তরিত হওয়াটা অন্য ব্যাপার— (কন্স্টিটিউশনাল

একজন অন্যকে ধর্মান্তরিত করার অধিকার পেলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকেও ধর্মান্তরিত করার দাবি করতে পারেন। সেই জন্য শীর্ষ আদালত মন্তব্য করেছে— কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভীতি বা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা যাবে না

ল, পৃঃ ৮৩)।

অন্য ভাবেও এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। ২৫ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে— ধর্মীয় অধিকার ভোগ করতে হবে 'public order, morality and health' অব্যাহত রেখে এবং সংবিধানের অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে। কিন্তু ধর্মান্তরকরণের প্রয়াস অন্যায় ধরনের হতে পারে বা ব্যাহত করতে পারে জন-শৃঙ্খলাকে। সুতরাং সেটা নিষিদ্ধ করা যায় বিধিবদ্ধভাবেই ---(ডঃ হরিহর দাস—ইন্ডিয়া ঃ ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ১২৩)। এটাও লক্ষণীয় যে, আমাদের কোনও অধিকারই অবাধ বা চূড়ান্ত নয়। সেগুলোকে ভোগ করতে হবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে (রতিলাল বনাম বম্বে, ১৯৫৪)। আর স্বরূপ বনাম পাঞ্জাবের মামলায় (১৯৫৯) শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল— কোনও কিছু একটা ধর্মীয় অধিকারের অঙ্গীভূত কিনা, সেটা কিন্তু আদালতই নির্ধারণ করতে পারে। অবশ্যই ধর্মান্তরকরণের অধিকার ধর্মীয় অধিকারের অবিচ্ছেদ্য বা অন্তর্নিহিত অংশ নয়— সুতরাং এটা স্বচ্ছন্দে দাবি করা যায় না।

কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই— বিশেষত দেশের উত্তরাংশে ও পূর্ব-দিকে খৃস্টান মিশনারীরা জনসেবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজ করে চলেছেন বহুকাল ধরে। তাঁরা মূলত মানুষের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও অশিক্ষার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। এটাই হয়তো দারা সিংকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমরা হিংসা, ঘৃণা, বলপ্রয়োগ ইত্যাদির ঘোর বিরোধী। কিন্তু মুদ্রার উল্টো দিকটাও দেখা দরকার।

এক বৃহন্নলা উপাখ্যান

(১ পাতার পর)

বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে অতিবড় মূর্খেও একথা বলতে পারে না। শহরের বড় বড় মসজিদের ইমামরা থাকেন নবাব-বাদশার মতো। তাদের চালচলন আমীরী, দারিদ্র্যের লেশমাত্র নেই। আর সুব্রত-ইদ্রিসদের বোধহয় গ্রামের ইমামদের সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। গ্রামের মসজিদে যিনি ইমাম থাকেন— গ্রামের প্রত্যেক পরিবার তাকে একদিন খেতে দেয়। সাধ্যমতন ভালোমন্দ। এছাড়া গোটা গ্রামে যার জমিতে বা যার বাড়িতে প্রথম কিছু হবে তা অবশ্যই দিতে হবে ইমামকে। বছরে একবার দিতে হবে জমির ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ। আর প্রতিমাসে গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে নির্দিষ্ট মাইনে। এরপরও যারা ইমামরা গরীব বলে গলা ফাটান তাদের সুবুদ্ধি নিয়ে সন্দেহ থাকলেও দুর্বুদ্ধি সন্দেহাতীত। একসময় কলিমুদ্দিন সামস যে ভূমিকা পালন করতেন এখন ইদ্রিস আলি সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ। সামস্‌সাহেব প্রতিটি মুসলিম মহল্লায় গিয়ে বলতেন আমি আগে মুসলমান— পরে ভারতীয়। আগে আমার ধর্ম পরে দেশ। ইদ্রিসবাবুও এখন কাছাকাছি গেছেন। তিনি একেবারে মাইনে বেঁধে দিয়েছেন, ইমামদের ২০ হাজার আর মুয়াজ্জিনদের ১৫ হাজার। মুয়াজ্জিন মানে যারা নামাজের আগে মাইক ফুঁকে সব মুসলমান ভাইদের জড়ো করেন।

সিপিএম তৃণমূল পরস্পর জন্মশত্রু অথচ এই একটি ইস্যুতে তৃণমূলের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে সিপিএম-এর বৃন্দা কারাত। কারাতের দোষ নেই। এরা চিরকালের ভারত বিদ্বেষী। মুসলীম লীগের দোসর। ভারত ভাগের সমর্থক ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা হিন্দু সংস্কৃতির কট্টর বিরোধী। সুগন্ধী বিষ্ঠা যেমন কষ্ট কল্পনা— তেমনই ভারতপ্রেমী কম্যুনিস্ট এক দুঃস্বপ্ন। সুতরাং সিপিএম নেত্রী যদি ইমামদের বেতনের দাবিতে সরব হন তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। ইমামদেরকে সরকার বেতন দিলে তারা যে হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধির সমর্থক হবেন এ নিয়ে আশ্চর্যের কিছু নেই। ইমাম কারা। এটা জানা দরকার। বেশিরভাগ হিন্দুর ধারণা আমাদের যেমন পুরোহিত ওদের তেমন ইমাম। অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি। তেমনভাবে কারও জানা নেই, কোনও কৌতূহল নেই। ভাবটা এমন, যেন এসব জেনে আর কি হবে। মাঝে মাঝে মনে হয় এদেশের বেশির ভাগ হিন্দু বোধহয় মেষ রাশি এবং গোত্রে খাসি। যখন তখন বধ্য। আমাদের পুরোহিতরা বাড়িতে, মন্দিরে অথবা প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজো করে বেড়ান। দু'চার টাকা দক্ষিণা পান। অনেকেরই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তেমন কোনও স্বচ্ছ ধারণা নেই। তবু না বুঝেই পুজোর আসনে বসলে সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের মঙ্গল কামনা করেন। ঠাকুরের সামনে জোড় হাতে বলেন, তিন ভুবন তৃপ্ত হোক। সমস্ত জীবকুলের মঙ্গল হোক। অরণ্য, সাগর, স্থাবর জঙ্গম এমনকি শত্রুরও মঙ্গল হোক। এই হচ্ছে আমাদের গ্রামগঞ্জের পুরোহিতকুল। প্রায় সকলেই দরিদ্র। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও ভোরে স্নান। গৃহস্থের মঙ্গল আর বিশ্বের মঙ্গল কামনায়। 'অথঃ উজানীনগরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বসতি স্ম'--- সেই কবে থেকে পড়ছি। এই দারিদ্রতাকে সঙ্গে নিয়েই সারা বিশ্বের সব ধর্মের সব জাতির মানুষের মঙ্গল কামনা।

ইমামরা কি করেন? ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে যার পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া হয় তিনি ইমাম। আর যারা নামাজ পড়েন তারা মোক্তাদি। ইমামদের দৃষ্টিতে যারা আল্লা অথবা তার পয়গম্বরকে বিশ্বাস করে না তারা সকলেই কাফের। চরম শত্রু। অর্থাৎ ভারতের সকল ইমামের দৃষ্টিতে সকল হিন্দু কাফের। এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এই ইমামরা যে নামাজ পড়েন এবং অন্যদের পড়ান সেখানে কি বলা হয়। বেশিরভাগ খাসি গোত্রের হিন্দুর ধারণা আমাদের হত- দরিদ্র পুরোহিতরাও যেমন বিশ্বের মঙ্গল কামনা করেন ইমামরাও বোধহয় তাই করেন। অজ্ঞতার চূড়ান্ত। নামাজের আগে আজান। আজানে বলা হয়। আল্লাহ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর আলহামদো ও অন্যান্য সুরা। সুরা ফাতেহা। সুরা কামেরুন ইত্যাদি। যেমন সুরা কামেরুন-এর বাংলা অর্থ— ''হে মহম্মদ— বল হে কাফেরগণ, তোমরা যার পূজা কর আমরা তার পূজা করি না। আমি যার এবাদত করি তুমি তার উপাসক নও।'' আরও আছে— ইমামরা নামাজে বলেন— যখন দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করবে তখন তুমি আল্লাহর প্রশংসা কর।' নামাজে অবশ্য পাঠ্য আপ্তাহিয়াত। সেখানে কি বলা হয়। আমাদের ও খোদার নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ ব্যতীত কোনও উপাস্য নাই। নিশ্চয় মহম্মদ আল্লাহর বান্দা।

এবার নিশ্চয় অতিবড় মূর্খেরও বুঝতে অসুবিধার কথা নয়— ইমামদের একমাত্র কাজ ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার। এর বাইরে কিছু নেই। বিশ্বের সব মানুষকে ইসলামে পরিণত করা একমাত্র লক্ষ্য। দেশের অথবা সমাজের এরা কোনও কাজে লাগে না। বছর দুয়েক আগে একটি গ্রামের মুসলমান গ্রামের শিশুদের পোলিও খাওয়াতে রাজী ছিল। তাদের বক্তব্য যদি ইমামসাহেব মসজিদের মাইকে ঘোষণা করেন, তবেই শিশুদের পোলিও খাওয়াবো। গিয়ে ধরা হলো ইমামসাহেবকে। সব শুনলেন। তারপর বললেন তোবা তোবা। ওসব আমি করতে পারবো না। এ মাইক তো শুধু আল্লার নাম প্রচারের জন্য। এই হলো ইমাম চরিত্র। এদের জন্যই দরদে বুক ফাটছে মেষগোত্রীয় নেতা-নেত্রীদের।

মোক্ষম বলেছেন সুদীপবাবু। পশ্চিমবঙ্গের বিড়াল বাহিনী দেবীর ডানহাত। তার মতে ইমামরা কি কষ্টে আছেন! আহা চোখে দেখা যায় না! কোন চোখে দেখছেন জানা নেই। ঠাকুমা বলতেন— রামছাগলরাও হাসতে জানে। দাড়ি নেড়ে হাসে। হয়তো বা সরকারি টাকায় ইমামদের বেতন বৃদ্ধি মানে তো দেশজুড়ে হিংসা আর বিদ্বেষে মদত দেওয়া। ইসলাম ধর্মের প্রচারকদের সরকারি কোষাগার থেকে মাইনে দিতে বলা মানে তো দেশকে ইসলামীকরণের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দেওয়া। এদের মুখ কোনটা আর মুখোশ কোনটা?

একটা গল্প বলি। গ্রামে যাত্রা হচ্ছে। নায়িকা মাঝে মাঝে এসে নেচে যাচ্ছে। নাচতে নাচতে একবার করে বুকের আঁচল অর্ধেক খুলে দিচ্ছে। তারপর চলে যাচ্ছে। কয়েক দৃশ্য পার হবার পরে আবার যখন নায়িকা মঞ্চে এসেছে তখন দু'তিনজন দর্শক চিৎকার করে বললো— আর একটু আর একটু। পাশে বসা এক বৃদ্ধ ফিস ফিস বললো--- হবে। বৃন্দা সুদীপ ইদ্রিসদের অবস্থাও তাই। অনেকদিন আগে সুকুমার রায় লিখেছিলেন, শিবঠাকুরের আপন দেশে আইনকানুন সর্বনেশে। এখন একটু পাল্টে বলা যায়— আহাম্মকের আপন দেশে, এক হয়ে যায় মুখ-মুখোশে।

গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে সিবিআই

(১ পাতার পর)

এস পি— আর এস পানওয়ার ২০০৬-এ গ্রেপ্তার হন। আপাতত তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন। ২০০৬-এ সিবিআই-এর আরেক সহযোগী আইনী উপদেষ্টা ডি কে শ্রীবাস্তবের বাড়ি থেকে নগদ চার লক্ষ ঘুষের টাকা উদ্ধার হয়। সিবিআইয়ের পদস্থ আধিকারিক ঘনশ্যাম চৌধুরী ২০০৪-এ গ্রেপ্তার হন ও পরে জামিনে মুক্ত হন। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। ওই বছরই ২৫,০০০ ঘুষের টাকা সহ ধরা পড়েন ইনস্পেক্টর এম এস শিসোদিয়া। গত বছরের ডিসেম্বরে তাঁকে ৬ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। ২০০৩-এ গ্রেপ্তার হন ইনস্পেক্টার কে এস রাই।

২০০২-এ সিবিআইয়ের এস পি বি এন শর্মার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। ২০০২-এ অপর এসপি-কে মুরলীধরের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়। এহেন দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের নিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করা কতটা সম্ভব, সে নিয়ে সন্দিহান খোদ সিবিআই-এরই একাংশ।

এর ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ তো রয়েছেই। ৬৪ কোটি টাকার বোফর্স অস্ত্র-চুক্তি কেলেঙ্কারী সমাধান করতে গিয়ে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে ফেলল সিবিআই। তবু কাজের কাজ কিছু হলো না! আরুশি তলোয়ার, রুচিকা গিরোত্রা কাণ্ডে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অপরাধীদের আড়াল করবার মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ইউপিএ ক্ষমতায় আসার পর সিবিআই-কে তাদের অস্ত্র হিসেবে যথেচ্ছ অপব্যবহার করেছে কংগ্রেস। যার সুযোগ নিয়েছে একদল দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী আমলা এবং ঘুষখোর কিছু সিবিআই আধিকারিক। ফলে ইউপিএ আসার বছর সাতেকের মধ্যেই গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে গিয়েছে একদা দেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় গোয়েন্দা সংস্থার।

এই সময়

ভিখিরী

'রাজ্যে ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। আর ভারত সরকারের ঋণ হলো ৩৯ লক্ষ কোটি টাকা।'— উক্তিটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, কে বেশি ভিখিরী? কেন্দ্র না রাজ্য? যদিও অসীমের কথা যাচাই না করে বিশ্বাসের পক্ষপাতী নন কেউই। কারণ শূন্য কোষাগারে বছরের পর বছর ঘাটতি-শূন্য বাজেট পেশ করে তিনি 'ম্যাজিসিয়ান অর্থমন্ত্রী'র তকমা যোগাড় করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। তবে কেন্দ্র-রাজ্য ঋণের পরিমাণ নিয়ে তাঁর বক্তব্যে কোনও ম্যাজিক নেই বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান। যদিও ঋণে জেরবার রাজ্যকে আগামীদিনে বিরোধী দলের শাসনে চলার ইঙ্গিত পেয়ে দেউলিয়া করার কার্যকলাপের মধ্যেই অসীম ম্যাজিক কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। যার প্রাথমিক ইঙ্গিত নিঃশুল্ক কয়লার জন্য কেন্দ্রের কাছে ৪৪৯৮ কোটি টাকা সেস চেয়ে বসা!

নির্লজ্জ বটে

বিরোধীরা এঁর সম্বন্ধেই বলেছিল 'মেরুদণ্ডহীন', 'দুর্বল'। বিস্তর গোঁসা হয়েছিল তাঁর। স্বাভাবিক, অর্থনীতির অমন পন্ডিত মানুষ, তাঁকে কিনা এইসব বাজে বাজে কথা বলা! তবে ওঁরা যে বিরোধী। এসব কথা দু' চারটে না বললে আর বিরোধিতা কিসের? কংগ্রেসী সান্ত্বনাবাক্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে। তবু তাঁর কাঁদুনী, বিরোধীদের একটু শালীনতা বোধ থাকবে না? এসব করে আর এতকাল সার্টিফিকেট-টার্টিফিকেট দেখিয়ে বেশ চলছিল মনমোহনের। কিন্তু গোল বাঁধল ইউকিলিকসের সাম্প্রতিকতম বিস্ফোরক অনুসন্ধানে, যাতে বলা হয়েছে ২০০৮-এ গদি টেকাতে ঘুষ দিয়ে সাংসদ কিনেছিল ইউ পি এ-১ সরকার। তদন্তের ধারে-কাছে না গিয়ে সংসদে ঘুষ নেওয়ার কথা বেমালুম অস্বীকার তো বটেই, উল্টে দাবী করে বসেন সরকারের কেউ আইন ভাঙেনি আস্থা ভোটের সময়। এনিয়ে বিজেপি সংসদের উভয় কক্ষেই মনমোহনের বিরুদ্ধে আনছে স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব। আর পথে-ঘাটে ফিসফিসানি চলছে-মেরুদণ্ডহীনতা কিংবা দুর্বলতা-কে ছাপিয়ে এখন মনমোহন নির্লজ্জতার নগ্ন উদাহরণ বটে।

স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ

২০০৬ সালে মুম্বাইয়ের তৎকালীন কনসাল জেনারেল মাইকেল ওয়েন মোদীকে 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন। ওয়েনের এহেন বক্তব্য প্রকাশ করেছে উইকিলিক্স। সেখানে মোদীকে দক্ষ-প্রশাসক, আইনের শাসন মেনে চলা রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহদানকারী প্রশাসক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ওয়েন জানাচ্ছেন, গুজরাত দাঙ্গায় মোদীর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। কিন্তু তারপরেও রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে তিনি ছিলেন আপোষহীন। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে ২০০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোদীকে একঘরে করতে ভিসা বাতিলের মতো নিন্দনীয় কাজ করতেও পিছপা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারও তার সরকারোচিত মনোভাব না দেখিয়ে রাজনীতির কারণে অকারণ মোদী বিরোধিতার উচ্চ স্বরগ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। ওয়েনের বক্তব্যে নিজের ফেলা থুতু এখন নিজেকেই চাটতে হচ্ছে আমেরিকাকে।

আতিথি কলম

বিহারে পরিত্যাজ্য লালু, এবার পালা ইতালীয়দের ?

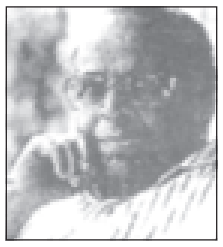

জয় দুবাসী

আমাদের পরিচিত বন্ধু লালুপ্রসাদ যাদবের জন্য আমি দুঃখিত বোধ করছি। কেননা, নিকট ভবিষ্যতে তার সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কমে গেছে। আগামী দিনগুলিতে লালুপ্রসাদ পাটনায় তাঁর স্ত্রী-র গরু-মোষের খাটালগুলির দেখভাল করতেই ব্যস্ত থাকবেন। বিহারের জনতা লালু ও তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে প্রায় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করেছেন। বিগত গত বিধানসভা নির্বাচনে যেখান থেকে তাদের মাথা তোলা চট করে আর সম্ভব তো নয়ই, হয়ত আগামী নির্বাচনেও তারা পরিত্যাজ্যই থাকবেন।

দুর্ভাগ্যের কথা, লালু নিজে কখনও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার কোনও চেষ্টাই করেননি, তাঁর এই সস্ত্রীক রাজনৈতিক নিধনের আসল কারণ। উল্টে এই ফলাফলকে রহস্যময় আখ্যা দিয়ে তার মুষ্টিমেয় বশংবদকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন কে বা কারা তাঁর এই ক্ষতি করল! আদতে কেউই প্রত্যক্ষভাবে তাকে কিছু করেনি, যেমন কেউই রাহুল গান্ধীকেও কোনও সরাসরি বাধা দেয়নি। বিহার জনতার রাজনৈতিক রোষ-এক্সপ্রেস তাঁদের ওপর দিয়ে সবেগে চলে গিয়ে ধরাশায়ী করে দিয়েছে।

প্রথমে আমরা লালুকে নিয়েই নাড়াচাড়া করব। যতদিন তাঁর হতভাগ্য বিহার রাজ্যটিকে নিয়ে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, ততদিন বেশ রসেবশেই ছিলেন। কিন্তু দিল্লি গিয়েই তিনি ফাঁদে পড়লেন সর্বশক্তিমান মিডিয়ার। যারা সব সময়ই ঝকঝকে ছবি আর চটকদার খবর খাওয়াতে পটু, তারা লালুকে টার্গেট করল। স্বভাবগতভাবেই কথাবার্তা একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলাই লালুর পছন্দের ছিল। কেননা, কোনও ইংরাজি শব্দই তিনি নির্ভুল উচ্চারণ করতে পারতেন না। সেইসব কথাবার্তা তিনি নিজের দেহাতি ভাষায় বসিয়ে বলতে শুরু করলেন। একবারও ভাবলেন না কখন তিনি মানুষের কাছে এক ভাঁড়ে পরিণত হয়েছেন। সারা দেশের কাছে তিনি হাসির খোরাক। হত-দরিদ্র বিহারবাসী ব্যাপারটা ভালভাবে নেয়নি। এমন একজন ভাঁড়ের হাতে তাদের রাজ্য পরিচালনার ভার তাদের কাছে অপমানজনক মনে হলো।

লালু কোনওদিনই সিরিয়াস ছিলেন না। নাহলে রাজ্য-পাট পরিচালনার ব্যাপারে কখনওই তিনি রান্নাঘর থেকে রাবড়িকে আমদানি করতেন না। হায়! বিহারীরা কিন্তু সিরিয়াস লোকের দ্বারাই পরিচালিত হতে চেয়েছিল। তাই তারা নির্দ্বিধায় নীতিশ কুমার আর সুশীল মোদীর হাতে রাজ্যপাট সঁপে দিয়েছেন। এই দু'জন কিন্তু কালেভদ্রে রসিকতা করেন, এমনকি তাঁদের যখন-তখন হাসতেও দেখা যায় না। মানুষ তাদের মূল্যবান ভোটটি ওঁদের দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ওঁরা তাদের আশা-আকাঙ্খার মর্যাদা দেবেন, এটাই তাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। ভোটপ্রার্থীরাও

সোনিয়া

রাহুল

তাদের এমন প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। অথচ চরম দারিদ্র্যসীমায় থাকা বিহারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনও ছোঁয়াই পায়নি। হতদরিদ্র মানুষগুলি এমন দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু প্রত্যাশা করেছিল, ন্যূনতম সম্মান ও মর্যাদা। চরম নিরাশার মধ্যে তারা আশা করেছিল তাদের অন্যতম প্রতিনিধি লালু অন্তত তাদের জন্য কিছু সুদিনের প্রতিশ্রুতি দেবেন। লালু দিয়েছিলেন বিদ্রূপ, কৌতুক। এটা তারা চায়নি।

নীতিশকুমার, মোদী বিহারের মানুষকে দিয়েছেন পরিবর্তনের আশা করার আশা। যেমন মন্দাক্রান্ত হতাশ আমেরিকানদের আশ্বস্ত রেখেছিলেন তাদের রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা। নিবিড় অন্ধকারে এই আশাই একটি আলোক শিখার মতো কাজ করে। আজকের বিজয়ীরা শুধুমাত্র আশাই দেখাননি, তারা কিছু করে দেখাতেও শুরু করেছিলেন। কেননা, তারা বিশ্বাস করেন, অবস্থা বদলাতে গেলে সিরিয়াস ও আন্তরিক হতে হবে।

অপেক্ষাকৃত ভালো রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল, চালু থাকা স্কুল, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি সারা ভারতবর্ষের মতো বিহারের ক্ষেত্রেও রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছিল। লালু এগুলি তাদের দেওয়ার কথা ভাবেননি। সাধারণ মানুষ ফাইভ স্টার হোটেল, বড় বড় সিনেমা হল, সবসময় পাতাল রেল— এত কিছু চায় না। ন্যূনতম দৈনিক প্রয়োজন মিটলেই তারা সুখী। ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকেও লালুর সরকার পরিস্থিতির কোনও উন্নয়নেই মাথা ঘামায়নি। তা এমন সরকার রেখে লাভ কি? মাদক-আসক্ত রোগীকে যেমন সুস্থ করার আগে তার শরীর থেকে প্রথমেই মাদকের বিষ ঝেড়ে ফেলতে হয়, নইলে চিকিৎসা শুরু করা যায় না। লালু ও তাঁর আত্মীয়স্বজন মিলে বিহারের প্রশাসনকে এমন চরম দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছিলেন যে নীতিশ-মোদীকে প্রথমেই দুর্নীতি দূরীকরণে হাত দিতে হয়। ভাবলে অবাক হতে হবে, বিহারে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও নির্ভরযোগ্য ঠিকাদার পাওয়া যাচ্ছিল না আর অন্য রাজ্যের কোনও ঠিকাদার তোলাবাজি ও আভ্যন্তরীণ কোনও গোলমালে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে— এমন ভয়ে বিহারে আসতে রাজি ছিল না। এমন একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নীতিশরা তাদের বিহারের উন্নয়নের কাজে লাগান। এই পরিবর্তন বিহারবাসীর নজর এড়ায়নি। লালুর আমলে পাটনা শহর পরিণত হয়েছিল মস্তান আর মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্যে। মেয়েরা সাধারণ শাকসব্জী কিনতে রাস্তায় বেরোতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। রুগীকে হাসপাতালে পৌঁছতে ভয় ছিল ভাঙ্গা রাস্তায় পথেই না কিছু ঘটে যায়। স্কুলে গেলে বাচ্চাদের অপহরণের আতঙ্ক। এমন পরিবেশ থেকে কিছুটা উত্তরণও চাট্টিখানি কথা নয়।

এখন এই ধীর পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত দিল্লি থেকে উড়ে আসা রাহুল গান্ধী ও তাঁর গর্ভধারিণী আদৌ টের পাননি। তাঁদের বিগত নির্বাচনী বক্তৃতাগুলি ছিল থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। বিহারে কিছুই হয়নি, সব গোল্লায় যাচ্ছে— অথচ মানুষ ঠিকই নজর করছিল নিশ্চিত সদর্থক পরিবর্তনের স্রোত। ভোটের বাক্সে এই দুই অপরিণত মস্তিষ্কের রাজনীতিককে তাঁরা দিল্লিতে পত্রপাঠ ফেরত পাঠিয়েছেন। যদিও জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির সংখ্যাবিদরা বিহারের চিরকালীন জাত-পাত, দলিত, মহাদলিত, মহিলা ইত্যাদির বস্তাপচা ভোট সমীকরণ নিয়েই নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন। এদিকে নিজেদের উন্নয়ন চাক্ষুষ করা বিহারী মহিলারা জাত-পাত, উচ্চনীচ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে নীতিশ-মোদীকে ক্ষমতায় এনে তাদেরও অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছেন।

তবে এখানে একটি কথা বলা খুবই জরুরি— এই পরিবর্তন শুধুই রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল দেওয়া সরকার আনতেই ভোট নয়। টিভির দৌলতে সারা ভারতের রাজ্যগুলির মোটামুটি ঝকঝকে তক্‌তকে রাস্তাঘাট, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা আর চিকিৎসা পরিষেবার কথা জানলেও বিহারবাসীর একটি মানসিক উপলব্ধি ছিল যে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে তারা যেন অর্ধশিক্ষিত লালু-রাবড়ি, রামবিলাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এর বাইরে আর কিছু ভাবা যায় না। তারা এই শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলেছে অথচ লালু-রাবড়ি-রামবিলাসের কাছে এমন পরিবর্তন অকল্পনীয় ও বিষবৎ।

বিহারের মানুষ আর একটি বিশাল ছলনাকে এই নির্বাচনে হাতেনাতে ধরে তার যোগ্য শিক্ষাও দিয়েছেন। যা কোনও মতেই ফেলনা নয়। রাহুল গান্ধীর কলাবতী-কেত্তন হয়ত অনেকেরই মনে আছে। সেই একই কায়দায় কিছুটা কোঁচাকানো কুর্ত্তা পাজামা পরে তিন দিনের দাড়ি রাখা মুখে দ্বারভাঙ্গার কোনও গরীবের বাড়িতে দুপুরের খাবার খেলেই যে বড় নেতা হওয়া যায় না, বিহারের মানুষ তা সরেজমিনে মনে করিয়ে দিয়েছেন। রাহুল—সোনিয়ার এই কপটতা তারা আদৌ বিশ্বাস করেননি। চার দশকের বেশি ভারতে থাকার পরও যে অন্তরাত্মা স্থানীয় ভাষায় কথা বলার কোনও আন্তরিক চেষ্টাই করেননি, এখনও লিখে দেওয়া বুলি ছাড়া দু'লাইনের একটা সাধারণ বক্তৃতাও যিনি নির্ভুল ভাবে দিতে অপারগ, তেমন মানুষেরা যে বিহারবাসীর ভাল-মন্দ নিয়ে সদা ভাবিত একথা বিহারের মানুষ সর্বৈব মিথ্যা ভেবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জোড়া নেতা-নেত্রীর চরম বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রাজ্যবাসী প্রকট করে দিয়েছেন।

গল্পের নীতিশিক্ষার মতো বিহার নির্বাচনের সংকেতটি হল আজ থেকে বছর চারেকের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে সোনিয়া অ্যাণ্ড কোম্পানির পরিণতিও লালুর মতোই হবে। মনে রাখতে হবে, লালুর বিহার ধ্বংসের কুকর্মে অবশ্যই গান্ধী পরিবারের পূর্ণ সহমত ছিল। দেশবাসী তাদেরও পরিত্যাগ করবে ঠিক যেমন তারা লালুকে করেছেন। সর্বভারতীয় নাট্যমঞ্চে বিহার নাটকেরই প্রলম্বিত মঞ্চায়ন সংঘটিত হবে। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। ভারতবর্ষের চেহারা আজ বদলে গেছে, আর তা এমন ভাবে বদলেছে যে পুরনো রূপ প্রায় নিশ্চিহ্ন। তাই আমদানী করা বিদেশী কুর্ত্তা পাজামার ছলনা আজ আর গ্রহণীয় নয়। দেশবাসী আজ বিদ্রোহের মুখে দাঁড়িয়ে আর এটাও স্মরণে রাখা জরুরী যে, হিন্দুর বিদ্রোহের সামনে বিশ্ববাসী কেঁপে যাবে। সন্দেহ থাকলে মোঘলদের কাছে যান, তুলনামূলক ভাবে আধুনিক বৃটিশদের কাছে যান। প্রশ্ন করুন, তাদের কেন চলে যেতে হল? এবার কিন্তু ইটালীয়দের পালা।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

অন্য রকম

পরম্পরার অর্ঘ্য

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত ভাষা এবং তার চর্চাকেন্দ্র 'টোল'গুলি যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তখন ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে বেশ কয়েকটি টোলে ছোট থেকে গুরুকুল শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

গুরুকুলের প্রবেশদ্বার।

এইরূপ একটি গুরুকুল বিদ্যালয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রতিবেদকের।

কর্ণাটক রাজ্যের চিকমাগালোর জেলার উড়ুপি থেকে ৫০ কিমি দূরে প্রবোধিনী গুরুকুলে ৮-১৫ বছর বয়সের ছাত্রদের আবাসিক হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রাচীনকালে গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা করার মতো এখানেও শিক্ষার্থীদের সকাল ৫টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বেদপাঠ, গো-সেবা, স্বাধ্যায়, কৃষিকাজ করতে হয়। ১২ একর জায়গা জুড়ে গুরুকুল, ৬ একর আবাস এবং ৬ একর জমি কৃষি কাজের জন্য নির্ধারণ করা রয়েছে। সকাল ৫টায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবাস পরিষ্কার করতে হয়, বেদপাঠ, নদীতে স্নান, পূজা শিক্ষা, স্বল্পাহার করার পর ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত তিনটি ক্লাস এবং দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে এক ঘন্টা বিশ্রাম। তারপর আবার তিনটে ক্লাস হয়। কর্ণাটকের আশপাশের গ্রামগুলি থেকে দরিদ্র ছাত্রদের নিঃশুল্ক হিসাবে ৬ বছরের জন্য এখানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত সঙ্ঘের শাখা। তারপর যোগাসন, ধ্যান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ এখানে একসঙ্গে যোগ, বিজ্ঞান, কৃষি, কলাকৌশল শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যবস্থা আছে। কানাড়ি, সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সংস্কৃত ভাষার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয় এখানে। বিকেলে প্রবোধনী গুরুকুলে গিয়ে দেখা গেল, ছাত্ররা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অধ্যয়ন করছে, সুর করে গীতাপাঠ করছে। বছরে দু'বার ১৫ দিন এবং ১ মাসের জন্য এইসব ছাত্ররা বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পায়। কথা হলো, ছাত্র ভরত মাণ্ডিয়া, আদিত্য এবং চাণক্যর সঙ্গে। তারা আনন্দের সঙ্গে এখানে থাকে, বাড়ির স্নেহ ভালবাসা এখানেই পেয়ে যায়। গুরুকুলে একটি পঞ্চদেবতা এবং একটি সরস্বতীর মন্দির রয়েছে, যেখানে ছাত্ররা পূজা-অর্চনা করে থাকে। গো-শালাতে ৩৫টি গরু রয়েছে, যাদের দেখ-ভাল করার দায়িত্ব এই গুরুকুলের ৮৩ জন ছাত্রের মধ্যে ভাগ করা রয়েছে। গরুগুলির নাম — সৌম ও সীতা সহ অনেক প্রকার। এই গরু লালন-পালন করে একদিকে যেমন দুধ ও গোবর পাওয়া যায়, তেমনি আবাস পরিষ্কার করতে এই গোবর কাজে লাগে। সব মিলিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যোজনাতে এই গুরুকুলে ছাত্রদের সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরে রেখে উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করবে।

ইউনুসের নোবেল-প্রাপ্তি নেপথ্যে বহু জালিয়াতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এবার ফাঁদে পড়েছেন ইউনুস চাচা। ভদ্র পোশাকের আড়ালে কুৎসিত চেহারাটা বের হয়ে পড়েছে। মহম্মদ ইউনুস। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজেতা। বাংলাদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। সম্প্রতি তাকে বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়াম্যান পদ থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি বহিস্কারের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েও সুবিধা করতে পারেননি। এখন তার বিশেষণ হলো—রক্তচোষা সুদখোর, ঘোরতর পাষণ্ডী, কপটাচারী। ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ভিত্তিক 'হর-কত-উল জেহাদ অল ইসলামি' সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং আল কায়েদাকে অর্থ সাহায্য করেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তো প্রথম থেকেই ইউনুসকে 'রক্তচোষা' (ব্লাড সকার) বলে অভিহিত করেছেন। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তার সম্পর্কের খবর বের হতেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ সরকারের কাছে প্রদত্ত ষাট পৃষ্ঠার রিপোর্টে ইউনুসের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগের পর্দাফাঁস হয়ে গেছে। ওখানে একথাও আছে বলে খবর যে, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর যে বি ডি আর বিদ্রোহ হয় তার পিছনেও হুজি (হরকত উল জিহাদ অল ইসলামি) এবং ইউনুসের ভালোমতন ভূমিকা ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে— ইউনুসের বিরুদ্ধে বিরাট পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির হদিশ পাওয়া গেছে। খবর হলো, নরওয়ে মাইক্রোফাইনান্সিং-এ দশকোটি ডলার অনুদান দিয়েছিল, তার কোনও হিসাব পাওয়া যায়নি। অফিসারদের আশঙ্কা ওই টাকা সন্ত্রাসবাদীদের তহবিলে চলে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় অফিসারের মতে, ইউনুসের দরিদ্রতম গ্রামীণ মহিলাদের খুব কম সুদে ধার দিয়ে তাদের জীবনস্তর উন্নত করার বিষয়টা শুধু প্রচারেই রয়েছে। আসলে তো, বিদেশ থেকে ওই কাজের জন্য দান অথবা মাত্র তিন শতাংশ সুদে প্রচুর টাকা নিয়ে আসেন। কিন্তু গরীব গ্রামীণ মহিলাদের ব্যাপক হারে সুদের বদলে দাদন দেওয়া হয়। তা ৪০/৫০ শতাংশ পর্যন্তও যেতে পারে। আদায় করার বেলায় এতটাই নির্মম যে অনেকে শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যাও করতে বাধ্য হয়। গোয়েন্দাদের ওই রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে,— এরকম মানুষ কীভাবে শান্তিতে 'নোবেল পুরস্কার' পেলেন? আরও বলা হয়েছে— কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের সঙ্গেও ইউনুসের গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনেক আগে থেকেই তিনি তাদেরকে ব্যাপক পরিমাণ অর্থ দিতেন। মৌলবাদীদেরও এরকম একজন লোকের দরকার ছিল প্রকাশ্যে যার প্রতিচ্ছবি বেশ ভালো। এবং তাদেরকে প্রয়োজনমাফিক মোটা টাকা দিতে পারে। ৯/১১-এর (আমেরিকার বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস) পর

সন্ত্রাসবাদীদের অর্থাভাব দেখা দেয়। অর্থদাতাদের উপরও বেশ নজর রাখা হচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে হুজি এবং আল কায়েদার ক্যাডাররা 'তবলীগী জামাত'-এর নামের ছদ্মবেশে সারা দুনিয়া জুড়ে মহম্মদ ইউনুসের গুণগান শুরু করে দেয়। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের পর মুসলমান জনমানসকে সন্তুষ্ট করতে তাদের ক্ষতে প্রলেপ দিতে এরকম একজন ব্যক্তির দরকার হয় তারা যাকে 'গ্লোবাল আইকন' হিসেবে দেখাতে পারে।

নোবেল কমিটি সন্ত্রাসবাদীদের এই ফাঁদেই 'পা' দেয়। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অসলোতে ইউনুস নিজের কাজের বিষয়ে যে ডকুমেন্টারি দেখিয়েছিল তাও মিথ্যে ও ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ ছিল। ওখানে দেখানো হয়েছিল চট্টগ্রামের গ্রামীণ এক মহিলা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাহায্যে জীবনে কত না উন্নতি করেছে, দোতলা বাড়ির মালিক হয়েছে। প্রকৃত তথ্য হলো, উক্ত মহিলা সুফিয়া এবং তার পরিবার এখনও এক দোতলা বাড়ির পাশে ঝুপড়িতে বসবাস করছে। ওই দোতলা বাড়ির মালিক জবাল হুসেন, সে দুবাইয়ে থাকে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'সন্মার্গ' পত্রিকাকে যে ব্যক্তি এসকল খবর দিয়েছে সে ওই জবাল হুসেনের আত্মীয়। জবাল হুসেন যখন মহম্মদ ইউনুসকে মামলা করার হুমকি দেয় তখনই চাচা ইউনুস ওই তথ্যচিত্র দেখানো বন্ধ করে। জবালের ওই আত্মীয় দৈনিক 'সন্মার্গ'-এর সঙ্গে সুফিয়ার দুই মেয়ে— নূরজাহান এবং হালিসার কথাবর্তা বলার ব্যবস্থা করে দেয়। সুফিয়া শেষ সময়ে ভিক্ষে করেও বাঁচতে পারেনি। মেয়েদের অবস্থাও তাই।

বর্তমানে আমেরিকার বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টন যখন রাষ্ট্রপতির পত্নী (ফার্স্ট লেডি) হিসেবে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন তখন ফায়দা তুলতে মহম্মদ ইউনুস 'হিলারি মডেল' নামে এক প্রকল্প শুরু করেছিলেন। মসীতলার ঋষিপল্লীতে এই প্রকল্প চালু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই পুরো গ্রাম টাকা ফেরৎ দেওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। 'হিলারি মডেল' বর্তমানে সুদখোর মহাজনী আতঙ্কে পরিণত। গ্রামের অনেক মেয়ে বিক্রী হয়ে গেছে, অনেকে আত্মহত্যা করেছে। বস্তুতপক্ষে ইউনুস চাচা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাকে নিয়ে এপার বাংলার কলকাতাতেও কম মাতামাতি হয়নি। অনেক আদিখ্যেতা দেখিয়ে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর জঘন্য আমানবিক অত্যাচার লাগাতার চলে আসছে। শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের জেলে যেতে হয়। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় দেয় রাষ্ট্র স্বয়ং, সেখানে একের পর এক মিলিটারি অফিসার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় দখল করে (১৯৭১, এরশাদ, জিয়াউর রহমান), শান্তির সপক্ষে কোনও জোরালো গণ-আন্দোলনই হয়নি।— সেখানের এক একক ব্যক্তি কোন্ হিসেবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান, তা নিয়ে অনুত্তরিত প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে।

যন্ত্রণার রেল : অসম-ত্রিপুরার মিটার গেজ লাইন

বাসুদেব পাল ॥ যদি আপনি কখনও ট্রেনে অসমের গুয়াহাটি থেকে আগরতলা, করিমগঞ্জ এবং শিলচর যাওয়ার পরিকল্পনা করেন এবং পয়সা বাঁচাতে ওই রুটে ট্রেনেই যেতে চান তাহলে এক-দুদিন হাতে রাখবেন। তা না হলে বিপদে পড়বেন।

শিলচর, আগরলা বা করিমগঞ্জ থেকে সরাসরি হাওড়া কোনও ট্রেন নেই। মাঝে লামডিং জংশন। লামডিং থেকে হাওড়া বা

কাটাখাল জংশনের করুণ অবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গে আসার জন্য কামরূপ এক্সপ্রেস এবং ব্রহ্মপুত্র মেল পাওয়া যায়। তবে গুয়াহাটি থেকেই গাড়ীর সংখ্যা বেশি। সেজন্য অনেকেই আগরতলা, ধর্মনগর, করিমগঞ্জ, শিলচর এবং বরাকভ্যালির বিভিন্ন স্থান থেকে ডে-সুপার (দিনের বারো ঘণ্টা) বা নাইট সুপার (রাতে বারো ঘণ্টা) বাস ধরে গুয়াহাটিতে এসে ট্রেন ধরেন। কিন্তু ট্রেন ধরাটা অনেক সময় হয়ে ওঠে না। কারণ বাসের রাস্তা খারাপ, আর ট্রেনের অস্বাভাবিক লেট। ট্রেনের ভাড়া বাসের অর্দ্ধেকেরও কম। ফলে মাগ্গিগণ্ডার বাজারে 'আমজনতা' একটু বেশি সময় লাগলেও ট্রেনে যেতে চান। কিন্তু ব্যবস্থা এতটাই পাকা যে, ট্রেনে গিয়ে ট্রেন ধরা যায় না। সময়, নিদারুণ কষ্ট এবং প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়। ফলে গাঁটগচ্চা দিয়ে বাসেই যাতায়াত করতে দক্ষিণ অসম, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামবাসীরা একপ্রকার বাধ্য হন। যাদের পয়সা আছে বা যোগাড় করতে পারেন তারা বিমানে যাতায়াত করেন।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, ট্রেন দেরী করে কেন? এর একটা কারণ হলো, আগরতলা থেকে লামডিং জংশন পর্যন্ত 'মিটার গেজ' এবং পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়ে ট্রেন যায়। এপথে ট্রেন, টিকিট এবং যাত্রার কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। ভাড়া যথেষ্ট কম, সময়মতো স্টেশনের টিকিট কাউন্টার খোলে না, কোনও কোনও স্টেশন তো চিরতরে বন্ধ। এর উপর রয়েছে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এবং উগ্রপন্থীদের জবরদস্ত দৌরাত্ম্য। অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায়, লামডিং-আগরতলা রেলপথের প্রায় পুরোটাই উগ্রপন্থীদের খাস-তালুক। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। যারা অর্থ উপার্জনের জন্য যাতায়াত করেন— তা চাকরি বা ব্যবসা যাই হোক না কেন? ভ্রমণার্থীরাও অনেক ক্ষেত্রে ছাড়া পান না। বাসের ক্ষেত্রে যাত্রীপিছু বখরা সরাসরি উগ্রপন্থীদের কাছে চলে যায় অনেক নিত্যযাত্রী জানিয়েছেন। মাত্র দেড়শো টাকার মতো ভাড়া দিয়ে আগরতলা থেকে গুয়াহাটি যাওয়া যায়। বাসের থেকে সময় একটু বেশি লাগে। যদি ট্রেন সময়মতো চলে। দুপুর আড়াইটায় আগরতলা থেকে আগরতলা এক্সপ্রেস লামডিং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পরদিন সকাল সাতটায় লামডিং পৌঁছানোর কথা। কিন্তু প্রায়ই তা হয় না।

মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে বাথরুম অপরিষ্কার, জল প্রায়ই থাকে না। লালুপ্রসাদের স্থানে মমতা ব্যানার্জী রেলমন্ত্রী হওয়ার পর মানুষ একটু আশা করেছিল। তবে কোনও পরিবর্তনই হয়নি। উগ্রপন্থী দৌরাত্ম্যে লাগাতার কয়েকমাস (২০১০) বদরপুর-লামডিং ট্রেনই বন্ধ ছিল। করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর জংশন স্টেশন। ওখান থেকে শিলচর, আগরতলা, লামডিং এবং মিজোরামের ভৈরবী পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন ও মালগাড়ি চলাচল করে। প্রায় একবছর যাবৎ লামডিং-বদরপুর সেকশনে যাত্রীবাহী ট্রেনে পার্সেল বুকিং বন্ধ। সাধারণত হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে লামডিং হয়ে বদরপুর পার্সেল যেত। এখন নিচ্ছে না। লামডিং থেকে গুয়াহাটি ব্রডগেজের ট্রেনে প্রায় চার ঘণ্টার পথ।

আগরতলা এক্সপ্রেস লেট করতে করতে সকাল সাতটার বদলে বিকেল সাড়ে তিনটায় পৌঁছাল। একবারের অভিজ্ঞতা। অতঃকিম্। একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন পাওয়া গেল। রাত্রি সাড়ে দশটায় অনেকেরই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে আসন সংরক্ষণ করা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন। গুয়াহাটি স্টেশনে যখন ঢুকল তখন তারিখই বদলে গেছে। রাত্রি দুটো। এরপর অসংরক্ষিত কামরায় ২৪ ঘণ্টা জার্নি করে হাওড়া আসা। এভাবেই চলছে— নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেল। গুয়াহাটি-এর্নাকুলাম্ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের অসংরক্ষিত কামরায় দাঁড়ানো তো দূর, হাওয়া গলারও জায়গা নেই। কতজন যে নির্দ্ধারিত ট্রেন ফেল করে ওই গাড়ি ধরলেন তার ইয়ত্তা নেই। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও কামরায় পাখা চালাতে হলো।

জামিরা স্টেশনে কলা দিয়ে কামরা ভর্তি করা চলছে।

ট্রেনের এই খামখেয়ালিতে লাভ কার, লোকসান কার? বলা বাহুল্য, লাভটা পরিবহণ লবি অর্থাৎ বাস মালিকদের। তাদের সঙ্গে রেলের অফিসারদের একটি দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে। বছরের পর পর আটকে রয়েছে শিলচর— লামডিং ব্রডগেজ লাইন পাতার কাজও।

একই অবস্থা বদরপুর-ভৈরবী যাত্রীবাহী ট্রেনের ক্ষেত্রে। তিনটি জেলা ও দুটি প্রদেশকে ছুঁয়ে যাচ্ছে এই ট্রেন। যাত্রীভাড়া অনেক কম। সারাদিনে একবার আসে, একবার যায়। তিন জেলার সংযোগস্থলে 'কাটাখাল' জংশন, জংশনের অবস্থা দেখলে ভিরমি খাবেন। কোনও সমতল স্থানই নেই প্লাটফর্মে। একটি কামরা দাঁড়াতে পারে এমন কোনও শেডও নেই। ট্রেনের অবস্থা মালগাড়ীর থেকেও খারাপ। গরু, ছাগল, কলা-মুলো, হাঁস-মুরগী এবং কাঠের চোরাচালান যায় ওই ট্রেনে। মিজোরামে ঢোকার আগের স্টেশন রামনাথপুর। রামনাথপুর অসম-এ আর ভৈরবী মিজোরামে। রহস্যজনক কারণে রামনাথপুরে ট্রেনের স্টপেজ তুলে দেওয়া হয়েছে। আগের স্টেশন জামিরা। প্রায় পাঁচ কিমি। রামনাথপুর ও ঘাড়মুড়া বাজারের বাসিন্দারা রামনাথপুরে ওঠানামা করতে পারেন না। স্টপেজ নেই।

রাজ্য সরকার, রেল বিভাগ ও সড়ক পরিবহন লবির মধ্যে এক শক্তিশালী যোগসাজশ গড়ে ওঠায় লামডিং থেকে বরাকে ব্রডগেজ সম্প্রসারণের কাজ স্তব্ধ রয়েছে। রাজ্য সরকার যেমন সড়ক পরিবহণ লবির প্রতিনিধিত্ব করছে, তেমনি

(এরপর ১৩ পাতায়)

রাজ্যে না আছে বিধায়ক, না আছে সাংসদ

সি পি এমকে ২৫,০০০ স্কোয়ার ফুটের সরকারি বাংলো ছাড়ার নির্দেশ মায়াবতীর

ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কম্যুনিজমের প্রাথমিক শর্তে একটি কথা বলা ছিল 'Property is theft' অর্থাৎ সম্পত্তি রাখা মানেই চৌর্য্যবৃত্তি। এর স্বপক্ষে বলা হোত জল, বাতাস, সূর্যতাপের মতো মাটি মানুষের যৌথ সম্পত্তি, পৃথিবীর তাবৎ ভূমির ওপর তাই মানুষের সমান অধিকার। এই বুনিয়াদী তত্ত্বকে ৮০'র দশকের শুরু থেকেই জলাঞ্জলি দিয়েছে বাংলার সিপিএম। এই কলিপর্ব থেকেই কম্যুনিজমের জায়গায় --- এখানকার শাসকদল নিখুঁত কৌশলে এক বিপুল নিত্যবর্ধমান স্থায়ী সম্পত্তি-শিল্প গড়ে তুলেছেন। সেখানে মাইনে করা ক্যাডার— উঁচু মাইনের প্রচার-সচিব থেকে এখন মূলত জমি ডেভেলপার-প্ল্যানারদের বিশেষ কদর। শিল্পে যেমন দু'রকমের Asset থাকে ফিক্সড ও কারেন্ট; এখানেও এই Fixed Asset-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়! খবরের কাগজ পড়লে বা নজর খুলে রাখলেই দেখা যাবে ৮০-র দশকের আটচালা সদৃশ পার্টি অফিসগুলির আজকের চেহারা প্রাসাদোপম (একটি চালু বাংলা দৈনিকে এ নিয়ে নিয়মিত লেখা হচ্ছে)। এগুলি পার্টি পরিচালিত শিল্পের স্থায়ী সম্পদ যা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এমনকি দুঃসময়েও দলকে সাহায্য করবে। আবার চলতি সম্পদ অর্থে নিয়মিত আয়ের উৎস ঠিক রাখা। বিভিন্ন ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দোকানদার, হকার, কুলি, রিক্সা-পুলার যা এখন সব চেয়ে জনপ্রিয় ডাইভারসিফায়েড সোর্স প্রোমোটারদের মাধ্যমে নগদ আয় বৃদ্ধি করা। দল পরিচালিত পুরসভা, করপোরেশান, পঞ্চায়েত ইত্যাদি গুলিতে বে-আইনী নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক আইনবিরুদ্ধ কাজকর্মে অনুমোদন দিয়ে আয়, মদের ঠেক থেকে তোলা আদায়— এগুলি চিরাচরিত আয়ের উৎস (Traditional Source of Income)। ব্যবসায় টিকে থাকতে গেলে আয়ের উৎস বাড়াতে হয় যেমন কর্পোরেট কোম্পানীগুলি যারা আগে শুধুই সিগারেট বেচত তারা রান্নার তেলও বেচছে, যারা শুধু সাবান-সোডা বেচত তারা বিস্কুটও বেচছে। ডাইভারসিকিফেশনের এই পণ্যটিকে খুব পারদর্শিতার সঙ্গে আয়ত্ত করে কমরেডরা এর থেকে দলের আয় বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলেছেন। একটি সংবাদপত্রে এই আয়ের একটি সুন্দর গ্রাফিকাল উপস্থাপনা নজরে এল। সেখানে মালবোঝাই গাড়ী, ট্যাক্সিওলা, ফুলচাষি, মাছের পার্সেলওয়ালা ইত্যাদি— যাঁরা নিয়মিত হাওড়া স্টেশন ব্যবহার করেন তাদের কাছ থেকে জুলুম বাবদ আদায় একেবারে কেস ধরে ধরে রেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিল্পপদ্ধতির ব্যাপারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— প্রমোশন বা পদোন্নতি। সংবাদে প্রকাশ হাওড়া স্টেশন চত্বরের এই অবৈধ বেআইনী কারবার দেখভাল করেন জনৈক এম এল এ। আগে ইউনিয়ন কর্তা থাকলেও তিনি বহু যুগ ধরেই পদোন্নতি করে দলের তরফে এই ব্যবসায় আয় বাড়িয়ে চলেছেন এবং যথাযোগ্য জায়গায় তার ভাগও পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ইনিই প্রমোশন পেয়ে ভবিষ্যতে হয়তো লোকসভায় বিবেচিত হবেন!

এই সেই প্রাসাদোপণ অট্টালিকা। উত্তরপ্রদেশে সরকারী বাংলাতে সিপিএমের পার্টি অফিস।

লেখা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তা হচ্ছে দলের সম্পত্তি-প্রেম। এটি প্রতিক্রিয়াশীল (দলের বিচার অনুযায়ী) চরিত্রের বা দক্ষিণপন্থী দলগুলির একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। অথচ দল মানুষকে যুগের পর যুগ ধোঁকা দিয়ে ব্যক্তিগত ও দলগত সম্পত্তি বাড়িয়ে চলেছে। রোমানিয়ার চেসেস্কু থেকে হলদিয়ার লক্ষণ শিট (ইনি আসলে অনুসূচিত জাতিভুক্ত শিট পদবীর অধিকারী। নাম পাল্টে শেঠ হয়ে মূল স্রোতে মিলেছেন) এক দীর্ঘ মিছিল। তার বিস্তার দরকার নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে যুগব্যাপী অপশাসন কায়েম রয়েছে সেখানে ছলে বলে কৌশলে এই সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্ভব হলেও দেশের সর্বত্র তা তো হবার নয়। কে জানে ভারতের অন্য অংশের মানুষ এ-নামের এই সর্বগ্রাসী সম্পত্তি ক্ষুধার আঁচ হয়ত আগেই টের পেয়েছিল নইলে আজও ভারতের কেরল ছাড়া অন্য কোথাও এদের ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশাধিকার দেয়নি কেন? যাই হোক, একটি অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর সংবাদের দিকে নজর টানতেই এই লেখা।

সম্প্রতি একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে --- যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মায়াবতী সিপিএম দলকে রাজধানী লক্ষ্ণৌ-এর অভিজাত বিধানসভা মার্গ এর ওপর অবস্থিত একটি সরকারী বাংলোতে তাদের ২৫,০০০ স্কোয়ার ফুটের বিপুল অফিস ছেড়ে দেওয়ার নোটিস পাঠিয়েছেন। ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মায়াবতীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর চারম দেউলিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া কারাট এক কাপড়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। সেই রাজনৈতিক পটভূমিতে দেখলে এর থেকে অবমাননাকর সরকারী আদেশ আর হতে পারে বলে মনে হয় না। মায়াবতী তাঁর এমন সিদ্ধান্তের পক্ষে তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে যা জানিয়েছেন তা আরও লজ্জাকর হলেও একেবারেই নির্জলা সত্যি। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ও বিধান পরিষদে সিপিএম দলের কোনও সদস্য নেই। তাই কোন অধিকারে তারা ২৫,০০০ স্কোয়ার ফিটের মতো এমন একটি সরকারী সম্পত্তি বাগিয়ে রাখবেন। ক্ষিপ্ত দল সরকারকে লিখেছে এরকম আরও কয়েকটি দলের সদস্য না থাকা সত্ত্বেও তারা বিতাড়নের চিঠি পায়নি কেন? এর সর্বশেষ উত্তর ২৫.২.১১ তারিখে সরকারী ভাবে দেওয়া হয়েছে---"The allotment therefore stands cancelled. Pl. vacate the house in three days."— মায়াবতীর এই নির্দেশের সারমর্ম আরও একটি অত্যন্ত চালু ব্যবস্থার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আয়কর দপ্তর প্রায়শই অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ী তল্লাশী করে তার বিরুদ্ধে কেস দেয় আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পদ সৃষ্টির জন্য। যার অর্থ তোমার যা ঘোষিত আয় তা বাদে অন্য আয় ছাড়া এমন সম্পত্তি করা যায় না। ২৫,০০০ স্কোয়ার ফুট পার্টি অফিসের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই মায়াবতী পক্ষান্তরে প্রয়োগ করেছেন। কোনও এম এল এ, এম এল সি, এম পি— কিছুই নেই তবু এত বড় সম্পত্তি নিয়ে কি করছ? তাই অফিস ছেড়ে দিতে বলা একেবারেই ন্যায়সঙ্গত, কেননা তা সরকারী সম্পত্তির অপচয়।

সবশেষে বলা যায় ২০০৯ এর ভোটে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' সেজে মায়াবতীকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বানানোর স্বপ্ন দেখার পর গত বছরেই মায়াবতীর রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করার বদলা নেওয়ার ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে মতাদর্শের চরম দেউলেপনা আর জমি জিগের অফিস বাড়িয়ে নিয়ে ভোগজাত করার অন্যায্য লালসাই যে সিপিএমের এমন বেইজ্জতির কারণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সূত্রঃ দি টেলিগ্রাফ

বাংলা ও বাঙ্গালীর কিছু বর্তমান সমস্যা

শৌর্যধ্বজ সৌকালীন ঘোষ

বাঙালী কল্পনাবিলাসী তাই দেশভাগের ৬৪ বছর পরও তার মানসপটে যে ক্ষত রয়ে গেছে তা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অখণ্ড দেশের স্বপ্ন দেখার মধ্যে আনন্দ পাওয়া ও রোমাঞ্চিত হওয়া থেকে পরিষ্কার। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখার মধ্যে নিজ নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতনতা প্রবলভাবে বিরাজমান। মুসলমান বাঙালী যখন অখণ্ড বাংলার কথা ভাবেন তিনি জানেন অখণ্ড বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে সে নিশ্চিন্ত ভাবে বাস করবে। হিন্দু বাঙালীর কাছে তা দুঃস্বপ্ন, বিশেষ করে স্বাধীনতার পরবর্তী ৬৪ বছরে যখন হিন্দু সম্প্রদায়কে অপমানিত হয়ে পূর্ববঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে ধীরে ধীরে চলে আসতে হয়েছে ও হচ্ছে তার ইতিহাস হৃদয়বিদারক।

অন্যদিকে হিন্দু বাঙালী যখন অখণ্ড ভারতের কথা ভাবেন তখন স্বাভাবিক-ভাবেই তার একথা স্মরণে থাকে যে অখণ্ড ভারতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় থাকবে এবং সেখানে সে নির্ভয়ে বাস করতে পারবে। এ থেকে উভয় সম্প্রদায়ের একে অন্য পক্ষের অধীনে থাকার অনীহাই প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই কল্পনাবিলাস এখন থাক। আর বাংলাদেশের দক্ষিণপন্থার উত্থানের পর পুনর্মিলনের আশা দিবাস্বপ্ন মাত্র।

সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫১ সালে পূর্ববঙ্গে মুসলমান ছিল জনসংখ্যার ৭৬.৯ শতাংশ ও হিন্দু ২২ শতাংশ, ১৯৯১-এ এই অনুপাত হয়ে দাঁড়াল মুসলমান ৮৭.৪ শতাংশ ও হিন্দু ১০.৫ শতাংশ। অপরদিকে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার অনুপাত ছিল হিন্দু ৭৮.৯ শতাংশ ও মুসলমান ১৯.৪ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯১ সালের জনগণনার রিপোর্ট থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ৭৪.৭ শতাংশ ও মুসলমান ২৩.৬ শতাংশ। এথেকে পরিষ্কার পশ্চিমবঙ্গের আচরণ অনেক অসাম্প্রদায়িক যা আমাদের গর্বিত করে। ২০১১-তে এসে পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা অধুনা বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশের আশে-পাশে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা এই বঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি।

পূর্ববঙ্গ তার জনগণের প্রতি সুবিচার করলে দলে দলে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু বাঙালীকে সর্বস্বান্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও আন্দামানে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসতে হোত না। একটা প্রশ্ন প্রায়ই উঠে যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বিভাজনের সময় পশ্চিম-পাঞ্জাবের সঙ্গে পূর্ব-পাঞ্জাবের যেমন জনবিনিময় হয়েছিল তেমন হলে বাঙালীর ঐক্য আরও দৃঢ় হোত কারণ ঐক্য দৃঢ় হতে গেলে বিভাজনও ন্যায্য হতে হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনস্রোতের ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির নাভিশ্বাস উঠে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে উদার আচরণে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের নবজাগরণের পুরোধা ছিলেন বাঙালীরা আরও স্পষ্ট করে বললে বাঙ্গালী হিন্দুরা। স্বাভাবিকভাবেই উক্ত নবজাগরণের প্রভাব পরবর্তীকালে বাঙ্গালী হিন্দুর উপর যেভাবে লক্ষ্য করা গেছে বাঙ্গালী মুসলমানের ক্ষেত্রে সেরূপ হবার সম্ভাবনা ছিল কম।

উদ্বাস্তু যাত্রা : বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের দিন। ভিটে-মাটি, শেকড় হারিয়ে উদ্বাস্তু জীবনের সন্ধানে ট্রেন-যাত্রা। সময় ১৯৪৭—৪৮ সাল।

১৯৪৭-এ শিল্পসমৃদ্ধ তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা ছিল ভারতবর্ষের যে কোনও অঙ্গরাজ্যের চেয়ে বেশি যার জন্য উদার গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা গড়ে উঠার ক্ষেত্র ছিল প্রস্তুত। অপরদিকে পূর্ববঙ্গের সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার উপর দাঁড়িয়ে দেশভাগের পর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থানই ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া ভারতবর্ষে নিরবচ্ছিন্ন গণতান্ত্রিক সরকার থাকার ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রকৃতিই ছিল অন্যরকম অপরদিকে দফায় দফায় সামরিক শাসনের কবলে থাকা পূর্ববঙ্গে গণতন্ত্রের ভিত এখনও বেশ দুর্বল। সেখানে সামরিক শাসকগণ পূর্ববঙ্গের উদার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম মেনেই নিয়ন্ত্রণ করেছেন ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থানকে সাহায্য করেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অঙ্গুলি হেলনে।

ঐতিহাসিক কারণেই শিক্ষায় দীক্ষায় হিন্দু বাঙ্গালী ছিল মুসলমান বাঙ্গালীর চেয়ে বহু এগিয়ে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু বাঙ্গালী যত শীঘ্র দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি মুক্ত হয়ে অসাম্প্রদায়িক উদার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে মুসলমান বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। যদিও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল কিন্তু তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উত্থান রোধ করতে পারেনি। অপরদিকে পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায় মৌলবাদী শক্তির নিকট লাঞ্ছিত হয়ে দেশত্যাগ করলেও দেশত্যাগকে তারা দেখছে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্ররোচনার অংশ হিসাবে ও তার বিরুদ্ধে তাঁরা সংগঠিত করেছে অসাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন। যদিও হিন্দু বাঙ্গালীর মন-মন্দিরে সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রশ্ন উঠেছে যে দেশভাগ হিন্দু মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য হলেও পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুকেই বেশী দেশত্যাগ করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানকে তো সেভাবে হয়নি।

হিন্দু বাঙ্গালী এর উত্তর খুঁজেছে মুসলমান বাঙালীর শিক্ষার অভাবের মধ্যে কিন্তু নিজের মনকে সাম্প্রদায়িকতার থেকে মুক্ত রেখেছে। কারণ তাঁর সনাতন ঐতিহ্যই তাকে সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। বাংলাদেশের তিন দিকে ভারতবর্ষ। উভয় সরকারের দায়িত্ব কূটনৈতিক পর্যায়ে উভয়দেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এখন উভয়দেশের মধ্যে জনবিনিময়ের চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তির চাপ বাড়ছে, বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু বাঙ্গালীর বঞ্চনার প্রশ্নকে উপেক্ষা করে আসছে। বাংলাদেশকে বুঝতে হবে যে সেদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তি মেনে নেবে না।

উন্নত দেশগুলির চেয়ে জীবন নির্বাহের সাধন প্রচুর কম হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার উভয় দেশেই আশানুরূপ হ্রাস পায়নি। আগামী ৫০ বছর এই বৃদ্ধির হার ধরে রাখলে উভয় রষ্ট্রেই সমস্যা বাড়বে। বাংলাদেশের সমস্যার গভীরতা হবে অধিক কারণ সে ছোট দেশ। পূর্ববঙ্গের ক্ষুদ্র পরিসরে তার বিপুল জনসংখ্যাকে আশ্রয় দেওয়া অসম্ভব হবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা ভারতের দিকে চলে আসবে। বিভূতিভূষণ নন্দী মহাশয়ের মতে প্রায় ২ কোটি বাংলাদেশী ভারতে বসবাস করছে। ভারত নিজেই জনসংখ্যার চাপে ক্লান্ত রাষ্ট্র তার উপর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের থেকে আগত অবৈধ জনস্রোত পূর্বভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পক্ষে ভয়ঙ্কর সমস্যার সৃষ্টি করবে। উভয় রাষ্ট্রই শিক্ষার প্রতি নজর না দিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমবে না। কারণ শিক্ষায় চেতনা জোগাবে ছোট পরিবারের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে। উক্ত কার্যে রাষ্ট্রকেই সফল হতে হবে না হলে বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে আসাম, উত্তর-পূর্বভারতের অন্যান্য রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতি প্রচণ্ড চাপে পড়ার সংশয় থেকে যাচ্ছে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যালঘু হয়ে পড়ায় ভয়কে তুলে ধরবেই। বাঙ্গালী হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যেভাবে স্বাধীনতা উত্তর জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী অঙ্ক কোষে বোঝাচ্ছেন যে প্রতি সেন্সাসে হিন্দুর জনসংখ্যা হ্রাস ও মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ক্রমশই পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসের চরিত্র বদলে যাবে যা দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গের পথ প্রশস্ত করবে বা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যাবে। জাতীয়তাবাদী শক্তি উপলব্ধি করছে যে হিন্দু তার গরিষ্ঠতা হারালে পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুর দশা পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুর ন্যায় হতে সময় লাগবে না। জাতীয়তাবাদী নেতারা জনগণনার রিপোর্টকে সামনে রেখে প্রশ্ন তুলছেন যে একবার অখণ্ড বঙ্গে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল ও উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে এবার পশ্চিমবঙ্গেও যদি ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু হয়ে পরে তবে দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হয়ে যাবার জায়গা নেই।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন নেতৃত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছে যে বর্তমান হিন্দু বাঙ্গালী নেতৃত্ব রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রতি বেশী অনুরক্ত। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তারা উদাসীন। তাই দরকার পড়লে সহজেই এই তথাকথিত হিন্দু নামধারী হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন বাঙ্গালী নেতৃত্ব সহজেই স্বধর্ম পরিত্যাগ করে যখন যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করবে। পশ্চিমবঙ্গে এ উদাহরণ তো আছে যে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতেছেন। বাংলাদেশে এ কথা চিন্তা করা যায় যে কেউ মুসলমান থেকে হিন্দু হয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে জিতছেন। এঁরা যখন হিন্দু ছিলেনও স্বধর্মের প্রতি মমতাবোধ থেকে একটি কথাও বলেননি। মুসলমান হয়ে বহুল্য প্রচারিত পত্র পত্রিকায় ভারতীয় মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিয়ে লিখতে সময় লাগেনি।

প্রগতিশীল আন্দোলনকে বুঝতেই হবে ভারতবর্ষের মানুষের সনাতন ধর্মের প্রতি অনুরাগকে এবং ভারতের সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্বকে এবং যত্ন নিতে হবে অনুপ্রবেশ বন্ধে। ভোটের লোভে এ ব্যাপারে চোখ বুজে থাকলে ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ আটকানো যাবে না। সহনশীল উদারবাদী পথেই এর সমাধান খুঁজতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সে পথের সন্ধান দিয়েছেন। বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙ্গালী ও উচ্চশ্রেণীর আশরাফ মুসলমান বাঙ্গালীর অর্থ-সামাজিক সমস্যা সমগ্র জাতির সমস্যা বলে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কারণ তাঁরাই নেতৃত্ব দিয়েছে সমগ্র জাতিকে তাই তাঁরা তাঁদের গুটিকয় মানুষের সমস্যা সমগ্র জাতির উপর চাপিয়ে দিয়েছে। দুই বাংলার নীচু শ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলন শক্তিশালী হলে, জমিসংস্কার ভালোভাবে হলে উদার গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত হলে এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তার হলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রভাব কমবে। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ আন্দোলন অনেকাংশে সফলভাবে হয়েছে পূর্ববঙ্গে হয়নি তা নয়। তবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত পূর্ববঙ্গে এখনও অনেক দুর্বল। গণতান্ত্রিক আন্দোলন উভয়বঙ্গে শক্তিশালী হলে বাঙ্গালীর ঐক্যও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা যাবে না কারণ বাংলা তখন ভারতের জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সমাজতান্ত্রিক পথ জরুরী কিন্তু এর সাথে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষের সনাতন মাটিতে আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে নাস্তিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যের ধাঁচে সমাজতন্ত্র অসম্ভব। তাই তিনি সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে সনাতন আধ্যাত্মবাদের প্রয়োজনীয়তার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। তিনি ভারতের আধ্যাত্মবাদ ও ধর্ম যে সমাজ জীবনের ভিত্তি তা উপলব্ধি করেছিলেন। এর জন্যই স্বামীজী Vedantism ও Socialism-এর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তার মতবাদে ও আমরা Vedantic Socialism নামে এক নতুন সুন্দর দর্শন ও পথনির্দেশ পেলাম। সুভাষ চন্দ্রের মধ্যে এর সার্থক প্রকাশ আমরা পাই। শ্যামাপ্রসাদও স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের

(এরপর ৯ পাতায়)

আয়ান হিরসি আলি মুক্তমনা এক মেধাবিনী

অদীনপুণ্য আচার্য

প্রগতিশীলতার ছায়া পড়া মানেই মৃত্যু— এর নাম ইসলাম। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন আয়ান হিরসি আলি। মোগাদিসু (সোমালিয়া)-র মেয়ে। এখন থাকেন সুইডেনে। আয়ান হিরসি আলির অপরাধ —তিনি তার বিকৃতকাম স্বামীর সঙ্গে থাকেননি। একসময় তাঁর বাবা ছিলেন সোমালিয়া-র প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তি। হিরসি মাগান ইসসে। সোমালিয়ার গণমুক্তি সংগ্রামের নেতা হিরসি মাগান, 'সোমালি স্যালভেশান ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টে' যোগ দিয়ে অত্যাচার স্বৈরাচার মধ্যযুগীয় ইসলামী বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়েছেন। তাঁর মেয়ে আয়ান হিরসি আলি ১৩ নভেম্বর ১৯৬৯-তে জন্মেছেন— রক্তে আছে মুক্ত চিন্তা, মানবতা, জীবনকে দেখার বলিষ্ঠ এক জোড়া চোখ। রাজনীতি শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর উপাধি পাবার পর এই মেয়েকে দেশ ছাড়া হতে হয়েছে। বাবার মুক্ত বুদ্ধির রাজনীতিও ইসলামের ফতোয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

সুইডেনের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে নতুন এক জীবনবোধে আকৃষ্ট হন আয়ান হিরসি আলি। ২০০১-২০০২-তে সুইডেনের পি ভি ডি এ (পারটিজ ভ্যান ডে আরবেইদ) তথা শ্রমিকদলে যোগ দেন হিরসি। পরে সেই দল ছাড়েন। ভি ভি ডি (ভোকস পারটিজ ভুত ভ্রিজহেউড এউ ডেমোক্রাটি) অর্থাৎ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী জনদলে নাম লেখান। ১১ সেপ্টেম্বর-এর হামলার পর হিরসি বোঝেন মুসলমান বলে তাঁকে সুইডেনের সবাই সন্দেহ করছে।

মনে মনে ভাঙছিলেন তখন থেকেই। কিছুদিন পরে পড়লেন নিরীশ্বরবাদীদের ইশতেহার (দি আথেইস্ট ম্যানিফেস্টো)। ঝুঁকে পড়লেন সেই দিকে। অস্বীকার করলেন ইসলাম ধর্ম। লিখলেন একটি বই ২০০২ সালে। কেমন করে ইসলাম ধর্ম হয়ে পড়েছে পুরুষ সন্তান জন্ম দেবার কারখানা— এই বইয়ের বিষয়বস্তু তা-ই। ''ডে জুনটি জেসফাব্রিক'' অর্থাৎ ('দি সন ফ্যাক্টরি'—) পুত্র-জন্মানোর কারখানা! এই লেখার পর আয়ান হিরাসি-কে ইসলামী উম্মা বিষ নজরে দেখতে থাকল। তাঁকে দেওয়া হলো খুনের হুমকি। ক্রমেই জীবন হয়ে উঠল দুর্বিষহ। ইসলাম ধর্মের শান্তিকামী মানবতাবাদী মুখোশটি খসে গেল— বের হয়ে এল দানবিক চেহারা।

বললেন আয়ান শারিয়া-র শাসন নারীর পক্ষে ভয়ঙ্কর। যদি তারা তাদের একতরফা বিচারে বোঝে কোনও মেয়ে অসতী তাহলে হত্যা করা হবে পাথর ছুঁড়ে ('are stoned to death')। আর তাঁর মতো 'জুরতাদ' ধর্মত্যাগী (apostate)-র জন্য বরাদ্দ বেত্রাঘাতে মৃত্যু। মোট কথা, শারিয়া-র শাসন অসাধুনিক, স্বৈরাচারী, মধ্যযুগীয়, বর্বর। অনেকের ধারণা ইসলামে এইরকম বর্বরতার বিধান নেই। একদল প্রান্তিক বা তথাকথিত আগুয়ান মুসলমানরা ('a fringe group of radical Muslims) ইসলাম ধর্মকে পণবন্দী করার মতো গ্রেপ্তার করেছে— নিজেদের তাঁবে এনেছে। আয়ান এই ব্যাখ্যা মানেন না। তাঁর মতে হিংসা ইসলামের অন্তর্গত সত্তা—'violence is inherent in Islam.' আর এ হলো ধ্বংসাত্মক, ভয়ঙ্কর, সন্ত্রাসী মৃত্যুর ধর্ম—'it's a destructive, nihilist cult of death.' হত্যা এই ধর্মে আইন সিদ্ধ— বিধিসম্মত 'It legitimates murder.' বলা নিষ্প্রয়োজন এরকম কথা ও মতামত যাঁর তাঁর ভবিষ্যৎ কি হতে পারে। ৯/১১-পরবর্তী পৃথিবী আজও এই আক্রমণাত্মক, নির্বুদ্ধিতার পাশে কোনও প্রকৃত শান্তির ব্যবস্থা চালু করতে পারেনি। তসলিমা নাসরিন বা সলমন রুশদিদের উন্মুক্ত পরিবেশে থাকার— কাজ করার, মতপ্রকাশ করার অধিকার দেওয়া যায়নি। আয়ান হিরসি-কেও কাজ করতে হচ্ছে লোকচক্ষুর আড়ালে। কোনওদিন শুনব তার জীবন অকালে নিঃশেষ হয়েছে।

২০০২-এর ১২ সেপ্টেম্বর সুইডেনের 'রনডনতিয়েন' পত্রিকায় তিনি লেখেন ইসলাম ধর্ম পশ্চাদপদ মতাদর্শ, একে কিছুতেই গণতন্ত্রের সঙ্গে মেলানো সম্ভব নয়। বস্তুত গণতন্ত্র কোথাও কোনওভাবেই ইসলাম ধর্মের জনসত্তার সঙ্গে মেলে না। প্রমাণ— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, ইরান— সর্বত্র। ২০০৩-এর 'শ্রু' পত্রিকায় লিখেছিলেন আয়ান মহম্মদের কথা। ৫২ বছর বয়সে, ৬ বছর বয়সী আয়েশা-কে বিয়ে করেছিলেন হজরত মহম্মদ! মিথ্যা নয়— আয়েশা— ছিলেন হজরত মহম্মদের তৃতীয় স্ত্রী। এর আগে ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছরের বিধবা খাদেজা আর ৫০ বছর বয়সে ৫০ বছরের বিধবা সাওয়াদাকে বিয়ে করেন তিনি। ৫২ বছর বয়সে আয়েশা তাঁর তৃতীয় স্ত্রী! ইসলাম ধর্মে চারটি স্ত্রীকে এক সঙ্গে বিয়ে করা যায়। কেউ ভাববেন না— রীতিটি মহম্মদ নিজের জীবনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য পরের বছর ২২ বছরের বিধবা হাফসাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি আরও নয়জন নারীর সঙ্গে বিবাহ করে অপূর্ব নজির স্থাপন করেছিলেন। আয়ান মোটেই ভুল লেখেননি।

থিও ভ্যান গঘ-এর সিনেমায় অভিনয় করেছেন আয়ান। ইসলাম ধর্মের সমালোচনার অভিযোগে 'হোফস্তাদ' নামে জেহাদি সংগঠন ২ নভেম্বর ২০০৪-এ আমস্টারডামে ভ্যান গঘ-কে হত্যা করে। ছবি-গানের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ সুবিদিত। তার ওপর সিনেমায় প্রকাশিত সমালোচনা। মনে হতেই পারে পছন্দ না হলে অন্য একটা সিনেমা তৈরি করাই কি সভ্য জনোচিত কাজ নয়? কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভ্যান গঘের মা তাঁর পুত্রের স্মরণ-সভায় সাহসী মেয়ে আয়ানকে অনুরোধ করেন তাঁরা যেন লড়াই না ছাড়েন। লড়াই তাঁর জারি আছে। থাকুক। মেধা মনন বুদ্ধি আর মনুষ্যত্বের লড়াই। তাকে থামানো যায় না।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কিছু বর্তমান সমস্যা

(৮ পাতার পর)

প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সমাজতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠাবান হলেও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন আজীবন। বিবেকানন্দ ভক্ত এই ত্যাগী দেশপ্রেমিক মানুষটি ভারতীয় সমাজতন্ত্রের প্রাণপুরুষ। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পথেই ভারত বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে চীনের মতো অর্থনৈতিকভাবে সবল হতে গেলে ভারতকে ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব অনুভব করতে হবে। নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার ২০ শতাংশ ভারতবাসীর মঙ্গল সাধন করলেও ৮০ শতাংশ তার পরিধির বাইরেই রয়ে গেছে। তাই দরিদ্র নারায়ণ সেবায় নিয়োজিত হতে হবে ভারতকে। ধনীমুখী সংস্কার থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদের প্রদর্শিত জাতীয়তাবাদী পথেই এগোতে হবে।

ভারত বৃহৎ শক্তি হলে এ অঞ্চলের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমস্যাগুলো সে তার নিজের মতো করে সমাধান করতে পারবে। নচেৎ পরমুখাপেক্ষী ভারতবর্ষকে ছোট প্রতিবেশীরা তার প্রাপ্য মর্যাদা দেবে না। বিশ্ব রাজনীতিতে চিরকাল সবলের জয় হয়েছে। ভারতকে সামরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতেও বলিয়ান হতে হবে। তা আসবে স্বামীজী প্রদর্শিত Vedantic Socialism-এর পথ ধরেই। তখন বাংলা ও ভারতীয় বাঙ্গালীর সমস্যার সহজ সমাধান হবে। ভারত হলো বিশাল বাজার এই বাজার অর্থনীতির যুগে পশ্চিম বিশ্বকে ভারতের শর্তে রাজি করানোর সবচেয়ে সহজ উপায় ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারকে প্রসারিত করা। গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। নিষ্ঠার সঙ্গে দরিদ্রনারায়ণের পূজা প্রয়োজন। ভারতের ২০ শতাংশ মানুষ যতই স্বচ্ছল হোক দেশের সম্মান বাড়াবে না যতক্ষণ না দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বচ্ছল হয়ে উঠতে পারছে। সনাতন ত্যাগের আদর্শে বলীয়ান হয়েও জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকবৃন্দকে সে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তবেই ভারত অর্থনৈকিভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। শক্তিশালী ভারতকে সমীহ করতে বাধ্য হবে প্রতিবেশীরা তখনই নিজেদের শর্তে প্রতিবেশীকে রাজি করানো সহজ হবে এবং তখনই স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ও বাঙালীর অনেক অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানের পথ বেরিয়ে আসবে। তখন অনৈতিকভাবে ভারতে আগত মুসলমান অনুপ্রবেশকারীকে তার আসা পথেই ফেরৎ যেতে হবে।

ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় না হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্যে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাংলাদেশ থেকে বহিরাগতের আগমনের সমস্যা আরও গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। ভবিষ্যতে বিশ্বশক্তি ভারতের কাছে বাংলাদেশকে মানতেই হবে এই অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যাকে, ভাবের ঘরে ওই বাংলাদেশী ভ্রান্তিবিলাসকে জাতীয়তাবাদী শক্তিশালী ভারত মেনে নেবে না। নিজ দেশের জনসংখ্যার দায় ও দায়িত্ব নিতে হবে সে দেশের সরকারকেই। অন্য দেশের উপর চাপিয়ে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে থাকলে মহাকাল তার মতো করে হিসাব মিলিয়ে দেবে। ১৯৫১ সালের ভোটার লিস্টে যে মুসলমান বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর পূর্বপুরুষের নাম নেই সে পরবর্তীকালে কিভাবে ভারতীয় হলো সে প্রশ্ন জোরের সঙ্গে উঠে আসবে। এমনকী ১৯৭১ সালে যে সকল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর পূর্বপুরুষের নাম নেই তাঁরাও প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন।

বিশ্ব শক্তি ভারতের সেই নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া প্রান্তিক শক্তিধর দেশগুলির সম্ভব হবে না।

এখনই ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহতম অর্থনীতি ২০৫০ এর মধ্যে ভারতই হবে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। আজ ভারত বিশ্বের চতুর্থ সামরিক শক্তি। ক্রমশ তার সে শক্তিও বৃদ্ধি পাবে। আর শক্তিশালী ভারতের জাতীয়তাবাদী মতামত ও শক্তি অর্জন করে নেবে। তখন বহুকালের অমীমাংসিত ভারতের প্রতি অন্যায়ের দায় মুক্তি আসবে স্বাভাবিকভাবে এখন আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে নিজেদের আর্থিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে, আর হৃদয়মন্দিরে ধ্যানে রাখতে হবে আধ্যাত্মবাদে বলিয়ান ভারতমাতার মূর্তিটি। শিবমন্ত্রে এগোতে হবে, বিশ্বে ভারতের সনাতন সত্যকে, প্রেমের মন্ত্রকে, সকলকে নিয়ে চলার প্রচেষ্টাকে, বাহিরের গতির সঙ্গে অন্তরের স্থিতিকে মিলিয়ে নেবার মহাওঁঙ্কার ধ্বনিকে, সত্যকে উপলব্ধি করে চৈতন্য শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পরকে আপন করে কিন্তু নিজের ধর্ম ও কৃষ্টিকে অস্বীকার না করে এগিয়ে যেতে হবে।

কলেজ স্ট্রীটের বিচিত্র কাণ্ড

রমাপ্রসাদ দত্তের লেখা 'কলেজ স্ট্রীট বই পাড়া জুড়ে চলেছে পাঠক-ঠকানোর বিচিত্র কাণ্ড' পড়লাম। সত্যি অন্যান্য ব্যবসার মতো বইয়ের ব্যবসাও এখন ছল-চাতুরিতে পরিপূর্ণ। এটা পাঠক সমাজের এক চরম দুর্ভাগ্য। তবে কলেজ স্ট্রীটের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী শুধু পাঠক ঠকাতেই সিদ্ধহস্ত নয়, তারা লেখক ঠকাতেও সমানভাবে পারদর্শী। প্রথমে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে পুস্তক প্রকাশের জন্য লেখকদের আকৃষ্ট করে। তারপর নানারকম কূট-কৌশলে লেখকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের অর্থ এবং পাণ্ডুলিপি হাতিয়ে নিয়ে মোটা মুনাফা লুঠতে চেষ্টা করে। লেখক মহলে একটু খোঁজ খবর নিলেই এমন অনেক অভিযোগ শোনা যায়। শুধু তাই নয়, পুস্তক প্রকাশের জন্য লেখকদের কাছ থেকে সহযোগিতামূলক অর্থ এবং রয়েলটির টাকার জন্য লেখককে প্রকাশকদের কাছে ঘুরে ঘুরে হতাশ হতে হয়। তখন তাদের মনে হয়, সাহিত্যচর্চা একটি পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এখন বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, লেখকগণ নিজের পয়সায় নিজেই অল্প কিছু বই প্রকাশ করে বন্ধু-বান্ধব এবং কাছের দু'চারটা লাইব্রেরিতে দান করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেষ্টা করেন।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

মাদার না.....?

মাদার টেরেসা নামটি যেই রাখুক না কেন, ভারতবর্ষে নামটি মানানসই নয়। মাদার টেরেসা যাদের সেবা করেছেন তাদের প্রত্যেককে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। মাদার মানে 'মা'। কোন মা সেবার আড়ালে কারও ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, আমাদের দেশের কোনও মায়ের এরকম কোনও উদাহরণ নেই। মা সারদার কথাই ধরুন না কেন। কতজনকে ধর্মান্তরিত করেছেন? কেউ কি বলতে পারেন? না। তিনি প্রকৃত মায়ের কাজ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতার ধর্ম পরিবর্তন করেননি। অথচ নিবেদিতা আমাদের দেশে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। মায়েদের বিদ্যালয়— প্রথম ভগিনী নিবেদিতা এদেশের মেয়েদের জন্য স্থাপন করে উনিশ শতকের ভারতে নারী শিক্ষার জাগরণ ঘটিয়েছেন। অথচ রেলমন্ত্রী নিবেদিতার নামে কোনও ট্রেন উদ্বোধন করেননি। মাদার টেরেসার নামে ট্রেন ঘুরছে সারা দেশে। খৃস্টানদের ভোটের জন্য? মাদার টেরেসার শতবর্ষে কোটি কোটি টাকা গরীবদের জন্য দিলেন উন্নয়ন হোত না! কেননা, গরীব মানুষগুলোকে খৃস্টান করার জন্য এই টাকা ব্যয় হয়েছে। এই কারণেই খৃস্টানমুলুক থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এটাকে সেবা না বলে রাজনীতি বলাই ভালো। জলপাইগুড়ি জেলায় বনবাসী এলাকায় ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ চলছে। অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ কিছু বলার নেই। সরকার তো ঠুঁটো জগন্নাথ। তার এগুলি দেখার সময় নেই। জনগণকেই সোচ্চার হওয়া উচিত। তা না হলে সরকার শুনতে পাবে না। ভারতের সর্বনাশ অব্যাহত থাকবে।

প্রবোধরঞ্জন বিশ্বাস, নয়াবস্তি, জলপাইগুড়ি।

নিজস্ব প্রচারমাধ্যম চাই

প্রচারসর্বস্ব যুগ। নিজেদের প্রচার এবং অপপ্রচারের জবাব— দুয়ের জন্যই চাই প্রচার মাধ্যম। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলারে সমৃদ্ধ দেশগুলি টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে সারা ভারতের সংবাদমাধ্যমকে। এদের কাজ নিরন্তর সঙ্ঘ পরিবারের নামে কুৎসা করে বিজেপিকে শাসন ক্ষমতায় আসতে না দেওয়া। এদের অপপ্রচারে সাধারণ বিজেপি কর্মীদের মন দুর্বল হচ্ছে, কখনও বা দমে যাচ্ছে। গায়ে লাগে এইসব সংবাদপত্র পকেটের টাকা খরচ করে কিনতে।

তাই আজ বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের আশু কাজ নিজেদের সংবাদমাধ্যম গড়ে তোলা। সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় এবং ইংরাজিতে একটি দৈনিক সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেল শীঘ্রই প্রকাশ করা। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। সি পি এমের মতো প্রায় আঞ্চলিক দলের রয়েছে গণশক্তির মতো সংবাদপত্র এবং আকাশ বাংলা, চব্বিশ ঘন্টা, কৈরালি টিভি চ্যানেল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পদক্ষেপ নিলে সারা ভারতে বিজেপি অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। কোনও শক্তিই তখন ভারতীয় জনতা পার্টিকে শাসনক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে পারবে না। কোনও সন্দেহ নেই, প্রচার সংখ্যার বিচারে ওই সংবাদপত্রটি এবং টিভি চ্যানেলগুলি সবাইকে পিছনে ফেলে দেবে। তখনই নতজানু হবে আজকের বাজারী সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম। তাই আমি আমার চিঠির দ্বারা সঙ্ঘ পরিবারের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রশান্ত কুমার কর, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

ঘৃণ্য চক্রান্ত বন্ধ হোক

বিগত দিনের ন্যায় সংবাদপত্রে ঘটনার সত্যতা বিচার না করেই অর্থাৎ মনগড়া বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ায় জনমানসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০.০২.১১ তারিখে মালদার একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির ঘটনা খবরের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সংবাদপত্রে মেয়েটির নাম এবং পিতার নাম উল্লেখ করার দুঃসাহস দেখায়নি। 'দৈনিক স্টেটসম্যান' পত্রিকাটি পীড়িতা হিন্দু পরিবারটিকে মুসলমান পরিচয়ে প্রকাশ করেছে। কথা হল, হিন্দু পরিবারটিকে অর্থাৎ নিখিলরঞ্জনবাবুকে 'শেখ' উপাধিতে প্রকাশ করেছে, তা কেন? বদমাস ছেলেটি (সাবির আলি) মুসলিম বলে? হিন্দুর মেয়েকে মুসলিম ছেলে আক্রমণ করেছে বলে হিন্দুরা ক্ষেপে যাবে, তাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা বলে? আমার কথা হল, ওই সমস্ত মেকি সংবাদপত্রগুলির এই দুঃসাহস দেখানোর পিছনে কি কিছু চক্রান্ত কাজ করছে! তারা কি মুসলিম সম্প্রদায়ের ভয়ে, নাকি প্রশাসনিক দমননীতিতে পড়ে অথবা কোনও বৃহৎ বৃত্তীয় চক্রান্তের দ্বারা নিজের সত্ত্বাকে বিক্রি করেছেন! আমি বলতে চাই, এইসব নোংরা মনোভাবাপন্ন প্রচারমাধ্যমের নোংরামির দ্বারা জনমানসকে দমিয়ে রাখা যাবে না। তারা যেন মনে রাখেন, তাতে করে যে দাবানল তারা জ্বালিয়েছে, সেই আগুনে সমাজের নোংরা মানুষ শুধু নয়, মেকি সংবাদমাধ্যমগুলিও জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে। আমি জনমানসকে জাগ্রত হওয়ার অনুরোধ করছি। সাধারণ মানুষ যেন ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার না হন।

রতনজ্যোতি রায়, জোরথাং, সিকিম।

পরিবর্তন আসুক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

ধীরেন দেবনাথ

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ঢাকে কাঠি পড়েছে। চারদিকে সাজোসাজো রব। দুই যুযুধান পক্ষ, অর্থাৎ বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস-তৃণমূল জোট সম্মুখ সমরে। যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে বিজেপি-ও। তবে সমদূরত্ব বজায় রেখে। কারণ, বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভাজনে বিশ্বাসী নয়।

বর্তমানে এরাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া উঠেছে। ক্রমে তা ঝড়ে পরিণত হতে চলেছে। পথে-ঘাটে, ট্রেনে, বাসে, অফিস-কাছারিতে, হাটে-বাজারে এমনকী চায়ের দোকানেও পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশ্যেই চলছে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক। সংবাদমাধ্যমও পরিবর্তন নিয়ে সোচ্চার। আর পরিবর্তন মানে রাজনৈতিক পরিবর্তন, বামফ্রন্টের পরিবর্তন, সরকারের পরিবর্তন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পরিবর্তন? না, বামফ্রন্ট তথা সি পি এম সরকার তার ৩৪ বছরের রাজত্বে সবদিক থেকে ব্যর্থ। যেমন, আইন-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, কর্মসংস্থান, উন্নয়ন, কর্ম-সংস্কৃতি ইত্যাদি। তবে ব্যর্থতার পাশাপাশি 'সফলতা'র খতিয়ানও বেশ বড়। যেমন— দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রাজনৈতিক খুনোখুনি, ইউনিয়নবাজি, বন্ধ, অবরোধ, চাক্কা জ্যাম, বেকারত্ব, ভ্রষ্টাচার, তোলাবাজি, পুকুরচুরি, রাহাজানি, নারীধর্ষণ, নিরাপত্তাহীনতা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারি, দুর্নীতি, শিক্ষায় অবনমন, কমরেডদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, অসাম্য, সংখ্যালঘু তুষ্টি ইত্যাদি। স্বভাবতিই আবার প্রশ্ন জাগে, পরিবর্তন তবে কার পক্ষে? উত্তর একটাই— তৃণমূলের পক্ষে। কেন তৃণমূলের পক্ষে? কারণ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরাজ্যকে সোনার বাংলা, স্বপ্নের বাংলা, সব পেয়েছি'র বাংলায় পরিবর্তন করবেন। প্রিয় ভোটারদের কাছে তাই বিনীত প্রশ্ন, তৃণমূলনেত্রী কী পারবেন এই বাংলাকে সেই বাংলায় পরিণত করতে?

না, পারবেন না। কারণ তৃণমূলের রয়েছে বহু দুর্নীতিপরায়ণ, সমাজবিরোধী, স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতালোভী ও সংখ্যালঘু

জনমত

তোষণকারী লোক। ভোট যুদ্ধে সি পি এমের বিরুদ্ধে মমতার আজ মূল অস্ত্র সংখ্যালঘু তোষণ। আর এই তোষণে সি পি এমের চেয়ে মমতা এক ডিগ্রি উপরে। মমতা প্রকাশ্যেই মাথায় ঘোমটা টেনে ইফ্তার পার্টিতে, ইদ্‌গাহের ময়দানে, মসজিদে মসজিদে দু'হাত তুলে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে নমাজ পড়েন। বক্তব্যের শেষে খোদা হাফেজ, সুকরিয়া, আদাব বলেন। ইসলামিক জলসায় বা মহ্‌ফিলে অন্যান্যদের ন্যায় দু'হাত খুলে আল্লার কাছে দোয়া মাগেন। ক্ষমতায় গেলে মুসলিম ভাইদের সরকারি চাকরিতে ২০ শতাংশ পদে (বুদ্ধদেববাবুদের ১০ শতাংশের বেশি) নিয়োগ, মাদ্রাসার সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি, বেসরকারি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি ও মসজিদের ইমাম—মুয়াজ্জিনদের ভাতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন বলে মোল্লা,মৌলবি, ইমামদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মমতা। তিনি মুসলিম ভোটে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে মুসলিম তোষণে, তৈল মর্দনে, প্রতিশ্রুতি প্রদানে কোনও ফাঁকফোকর রাখছেন না। তিনি ইতিমধ্যেই রেলে মুসলিমদের নিয়োগ করতে শুরু করেছেন, রেলের পরীক্ষা উর্দুতে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এবং আজমীর শরিফ, ফুরফুরা শরিফ ও আরও কিছু দরগাহের সঙ্গে রেল সংযোগ করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কাজেই মুসলিমদের এতসব প্রাপ্তির পরেও তাঁদের চাহিদা আরও বেড়ে গেলে তা পূরণ করতে দিদি পারবেন তো? এরাজ্যের হতভাগ্য হিন্দুরা ক্ষমতাবান মুসলিমদের দ্বারা নির্যাতিত হলেও ভোটের স্বার্থে দিদি নিশ্চয়ই কিছু না দেখার ভান করতে বাধ্য হবেন। তাই ভোটারদের কাছে সনির্বন্ধ আবেদন, এমন পরিবর্তন ঘটাবেন না, যাতে এরাজ্যে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা পরিণত হয় সংখ্যালঘুতে। পরিবর্তন আনুন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, হিন্দুদের বাঁচার স্বার্থে। সি পি এম নয়, তৃণমূল নয়, প্রকৃত পরিবর্তন আনতে পারবে একমাত্র বিজেপি—ই।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক **দীপেন সেনগুপ্তের** তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

মঙ্গলনিধি

গত ৯ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহাড়ি খণ্ডের বদলপুর শাখার মুখ্য শিক্ষক সুভাষ হেমব্রমের বোন শ্যামলি হেমব্রমের বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যার পিতা শ্রী ভাতড় হেমব্রম খণ্ড প্রচারক অথীন সিংহের হাতে সমাজ সেবার জন্য দুই শত টাকা উত্তরবঙ্গ সেবাভারতীকে অর্পণ করেন।

* * *

গত ২২ ফেব্রুয়ারি তমলুক শহরে বৌভাতের অনুষ্ঠানে সুধাংশু সামন্ত তাঁর পুত্র সুতনু সামন্তের বিবাহ উপলক্ষ্যে মঙ্গলনিধি হিসেবে ২০০০ টাকা সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিতের হাতে তুলে দিয়েছেন।

* * *

গত ৭ মার্চ মালদা জেলার গাজোলের স্বয়ংসেবক স্বপন চক্রবর্তী তার ছেলে শিবব্রত'র উপনয়ন উপলক্ষে সঙ্ঘর স্থানীয় প্রচারক মলয় দত্তের হাতে মঙ্গলনিধি ১০০১ টাকা কাকা মহেন্দ্র চক্রবর্তীর মাধ্যমে দিয়েছেন সঙ্ঘ কার্যের জন্য।

শোক সংবাদ

গত ৩ মার্চ ভোরে মালদহ জেলার বটতলী গ্রামে ধর্মনগর বিভাগ প্রচারক পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের মাতৃদেবী পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

* * *

মালদা জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি প্রণয় রায় (৮০) গত ১৪ মার্চ সকালে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ পরিবার একজন অভিভাবককে হারাল। তাঁর স্ত্রী বন্দনা রায় রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির দায়িত্বে রয়েছেন।

সঙ্ঘ-প্রণেতা ডাঃ হেডগেওয়ারের কষ্টিপাথরে প্রকৃত দেশভক্তের বিচার

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারজী দেশভক্তির ব্যাপারে নয়টি ভাবনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেক ভারতীয়ের দেশভক্তি এই নয়টি কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া উচিত। বর্ষ প্রতিপদ উপলক্ষে সেই ভাবনাগুলি প্রকাশিত হলো।

সাধনানন্দ মিশ্র

(১) জন্মভূমির প্রতি আত্মীয়তা

ডাক্তারজী দেশভক্তির অর্থ বলেছেন— ''যে ভূমি ও সমাজে আমার জন্ম, সেই সমাজের প্রতি ও সেই ভূমির উপর আমার আত্মীয়তা ও মমতা থাকবে এমনভাবে যে, তা যেন বোধগম্য হয়।'' যে ভূমিতে দেশভক্তের জন্ম, সেই ভূমিকে পিতৃভূমি, মাতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলে মনে করা ও স্বীকৃতি দেওয়া। 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ'— অর্থাৎ ভূমি আমার মাতা, আমি সেই মাতার পুত্র। দেশভক্তের এই জ্ঞান থাকা উচিত যে, ধরিত্রীমাতা তাঁকে পোষণ, পালন ও সংরক্ষণ করছেন। সারাদিনের কাজকর্মের মধ্যে জন্মভূমি ও সমাজের প্রতি আত্মীয়তা ও মমতাকে প্রকাশ করা প্রয়োজন। মায়ের ব্যথা-বেদনাও যেন ব্যথিত করে, মায়ের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ হলেই তবে প্রকৃত মাতৃভক্ত হয়। সেই দেশভক্তের চরণে সকলে কোটি কোটি প্রণাম করে।

(২) পরম্পরা ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা

দেশভক্তির অর্থ হচ্ছে, যে সমাজে আমি জন্মগ্রহণ করেছি সেই সমাজের গৌরবময় পরম্পরা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রেম ও গৌরববোধ।

আমাদের রাষ্ট্র অতি প্রাচীন ও মহান্। আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানের গঙ্গায় কোটি কোটি মানুষ তাদের কলুষিতভাব দূর করে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে পবিত্র ও শুদ্ধ হয়েছেন। বিশ্বের বন্দনীয় জগদ্‌গুরু আমাদের এই দেশে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, মনীষী, সাধু-সন্ত তাঁদের তপস্যালব্ধ ফল নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে, যারা বিশ্বের মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। ভারতই হয়েছে সারা বিশ্বের শিক্ষক।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং
সর্বমানবাঃ।।

সংস্কৃতি রাষ্ট্রের আত্মা। আজকালকার বস্তুতান্ত্রিক বাসনাযুক্ত সংস্কারে বিচলিত ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মানুষ সুখ শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভারত সংস্কৃতির পরম্পরাই একমাত্র সুখ ও শান্তি দিতে সমর্থ। এর প্রতি পরম বিশ্বাস, অটুট ভক্তি মানসিক প্রেমই আসল দেশভক্তির কষ্টিপাথর।

(৩) জীবনের মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা

দেশভক্তির অর্থ হচ্ছে, সমাজ দ্বারা পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত জীবনমূল্যের প্রতি চরম নিষ্ঠা।

জীবনের লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের মহান্ ঋষিরা মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠার জন্য সুদূর পথ নির্মাণ করে গেছেন। জীবনের মুক্তির পথে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ রয়েছে। এই চারটি পুরুষার্থ জীবনকে ক্রমশ মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ'... — অর্থাৎ প্রথমে ধর্ম আচরণ কর, এই ধর্ম থেকেই অর্থ ও কাম লাভ হয়ে যাবে। আমার সমাজই আমার ঈশ্বর এবং আমি সেই সমাজের সম্পত্তির রক্ষক। শরীরের পালন ও পোষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, মানুষের কেবল সেইটুকুতেই অধিকার, তার বেশী গ্রহণ করলেই সে চোর হয়, এজন্য সে দণ্ডনীয়। ভারতের সাংস্কৃতিক পরম্পরার অনুকূলতা থেকেই বিশ্ববাসী শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'— সত্য একই, ঋষিরা বিভিন্ন রূপে একে দেখেন।

ধর্মকে সম্প্রদায়ের পর্যায়ে ফেলা যায় না। অর্থাৎ, ধর্ম সম্প্রদায়বাচক নয়। আমাদের এই ধর্ম স্থাপনার অর্থ সুসংগঠিত সমাজের স্থাপনা, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে একত্ব বা একাত্মতা অনুভব করবেন। সারা বিশ্বচরাচরের মধ্যে একাত্মতার অনুভব করাই চরম সত্যের অনুভূতি। 'একাত্ম মানববাদে'র উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শই সংসারে আমাদের আদর্শ, এই জীবনদর্শনই সংসারের সম্মুখে আদর্শ। দেশভক্ত এই মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে নিজ জীবনযাপন করে চলেন। দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজকে সুখী করার জন্যই সর্বদাই প্রয়াস করে চলেন।

(৪) দেশের জন্য সর্বস্ব অর্পণ

দেশভক্তির অর্থ এই যে, নিজের সমাজের উৎকর্ষের জন্য এবং পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করার প্রেরণাদায়ী শক্তির স্ফূরণ।

দেশের প্রতি আত্মীয়তা, দেশের সংস্কৃতির প্রতি গৌরববোধ, জীবনের মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা— এই সব কাজের চরমসীমাই হচ্ছে সর্বস্ব সমর্পণ। আমার সব কিছুই রাষ্ট্রের জন্য সমর্পণ— 'রাষ্ট্রায় স্বাহা'— এই সূত্রই দেশভক্তের জীবনের একমাত্র সম্বল হয়ে যায়। তার যোগ্যতা, ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠা, শরীর, মন, ধন সব কিছুই দেশের জন্য অর্পণ করে। তার দৈনন্দিন কাজে সর্বস্ব সমর্পণ করার ভাবনা বিকশিত হয়। কোনও ভীতি তাকে বিচলিত করতে পারে না। মোহের কঠিন বন্ধনও তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। সেই মুহূর্তে সে নিজের ভাব ব্যক্ত করে বলতে থাকে,—

''আমার ব্যক্তিগত সংসারকে দেশকল্যাণ যজ্ঞে পূর্ণ আহুতি দিলাম। দেশের কল্যাণের জন্য আমার অতুল ধনভাণ্ডার 'স্বাহা' বলে পূর্ণ আহুতি দিলাম। মোহের কঠিন বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে রাষ্ট্রের হিতের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করলাম।''

(৫) সমষ্টিনিষ্ঠ জীবন

দেশভক্তির অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ও সমষ্টি-নিষ্ঠ জীবনের পবিত্র গঙ্গাপ্রবাহ। এই একটি অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য দেশ যেখানে মানুষের হৃদয় এত বেশী উদার ও মহান্ যে, সমগ্র মানবজাতি একাত্ম হয়ে এই দেশের ভাবধারার সঙ্গে মিশে যায়, শুধু তাই নয়, পশু-পক্ষী-বৃক্ষলতাও দেশের এই উদার জাতি বা মানবসমাজের মধ্যে স্থান করে নেয়। পিণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পিণ্ড, বীজের মধ্যে বৃক্ষ ও বৃক্ষের মধ্যেই বীজ নিহিত— এই অখণ্ড ভাবনা প্রতিটি জীবের মধ্যেই রয়েছে। জীবনকে ব্যষ্টি, সমষ্টি, সৃষ্টি ও পরমেষ্টি— এই চারটি সোপানের মাধ্যমে উচ্চস্তরে উন্নীত করতে হয়। দেশভক্ত কখনও 'আমি ও আমার পরিবার'— এই ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকে না। সমষ্টির মাঝখানে সে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। সে নিজের বাঁচার জন্য প্রকৃতিকে শোষণ করে না, বরং দোহন করে। সে সকলের সুখে সুখী থাকে। দেশভক্তের মন্ত্র— সমস্ত প্রাণীগণের কল্যাণ হোক্।

''সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্
দুঃখভাগ্‌ভবেৎ।।''

সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রকৃতিই দেশভক্তের পরম ইষ্ট লাভের সাধনভূমি।

(৬) ভোগ-লালসার উচ্ছেদ

দেশভক্তির অর্থ হচ্ছে, সর্বপ্রকার ভোগলালসাকে পরিত্যাগ করে বাৎসল্যভাবে সমাজকে দেখার জীবনদৃষ্টি লাভ করা।

অনাদিকাল থেকে একটি মহান্ সু-সংস্কৃত সমাজ, যাকে হিন্দুসমাজ বলা হয়ে থাকে, সেই হিন্দুসমাজ ভারতবর্ষে ভূমিপুত্র হিসেবে বাস করছে। ভারতমায়ের পুত্র আমরা সকলেই ভাই ভাই। ভাষা, প্রদেশ, পূজাপদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের ভারতমাতাকে তাঁর বাৎসল্যভাব থেকে বঞ্চিত করতে পারি না। আমাদের পবিত্র ভূমি ভারত— দেবতারাও যাঁর মহত্ত্বের গুণগান করে থাকেন,— তিনি আমাদের সকলের মা— আমাদের তেজস্বিনী মাতৃভূমি।

যে মায়ের ব্যথা বেদনা উপলব্ধি করতে পারে, সেই তাঁর প্রকৃত পুত্র। ভোগলালসায় লিপ্ত, দলগত রাজনীতিতে বিপর্যস্ত, সঙ্কীর্ণ বিচারধারার দ্বারা মায়ের কষ্ট উপলব্ধি করা যায় না।

প্রকৃত দেশভক্ত এই ভারতমাতার মন্দিরের সবসময়কার পূজারী। সে কখনও ভোগলালসায় লিপ্ত হয় না। সে নির্মোহী ও কর্তব্যে কঠোর ও অটল থেকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী সমূহ ভাব ও তত্ত্বকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে বাৎসল্যভাবেই সমাজকে দেখে।

(৭) সমাজের মঙ্গলের জন্য আপনার সম্পূর্ণ শক্তিদান

দেশভক্তির অর্থ হচ্ছে, সমস্ত ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা সমূহ সমাজের চরণে সমর্পণ করে নিজের সম্পূর্ণ শক্তি সমাজের সেবায় লাগিয়ে দেওয়ার কঠোর কর্তব্যের প্রেরণা।

শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক বা আত্মিক বিকাশই মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষণ। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দ্বারাই মানুষ পশু থেকে মানুষ, মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে পারে। দেশভক্তের সবল শরীর, সংযত প্রাণ, সদ্‌বিচারে পরিপুষ্ট মন, সত্যান্বেষী বুদ্ধি, সেবার দ্বারা আত্মিক আনন্দ— সবই সমাজের চরণে সমর্পিত। সে নিজের শরীর মন, ধন, আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা প্রভৃতি সবই সমাজকে অর্পণ করে থাকে। তখন সে বলে, ''মা, তোমাকে আমার শরীর, মন ও জীবন সমর্পণ করলাম। আমি প্রার্থনা করি, তোমাকে যেন আরও কিছু দিতে পারি।'

(৮) ভারতমাতার চরণে জীবনকুসুম সমর্পণ

দেশভক্তির অর্থ হচ্ছে, মাতৃভূমির চরণে সমর্পিত অনন্য নিঃস্বার্থ কর্তব্য, কঠোর জীবন, পুষ্পের মাদক সুগন্ধ, জীবনের যৌবন, বিকাশ, সদ্‌গুণের সুরভি, বাণীর মধুরতা, ভাব, আহ্লাদ, তাল ও সংগীত— এসব কিছুই দেশভক্ত মাতৃভূমির চরণে সমর্পিত করে।

(৯) সমাজের সঙ্গে একাত্মতাভাব

দেশভক্তির অর্থ হচ্ছে, সম্পূর্ণ সমাজের সঙ্গে একাত্মভাব। মানুষ একা থাকতে পারে না, সামাজিক বেষ্টনীর মধ্যে জীবনকে উন্নত করাই লক্ষ্য, এই লক্ষ্যের পূর্ণতা সামাজিক বেষ্টনীর মধ্যে আরও বাড়তে থাকে। দেশভক্ত সমাজের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। দেশভক্ত এই চরম সত্য পথের অনুগামী হয়ে থাকে।

প্রত্যেক ভারতীয়ের দেশভক্তি এই নয়টি কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া উচিত।

(বর্ষ-প্রতিপদ উপলক্ষে প্রকাশিত)

—'সেবা সমর্পণ' মাসিক পত্রিকা, দিল্লী— জুলাই ১৯৯৩ সংখ্যা থেকে সংকলিত।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মভিটে আজ সাপ, পোকা-মাকড়ের আঁতুড়ঘর

পায়েল বাগচী।। সরকারি উদাসীনতায় বিস্মৃতির অতলে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রাম- পঞ্চায়েতের রথতলায় কবি ঈশ্বরগুপ্তের জন্মভিটে। সেখানে রয়েছে কবির একটি মূর্তি ফলক, এখন তা জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। এছাড়া এলাকাটি 'ভারতীয় পশু চিকিৎসা সংস্থান' পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষেত্রীয় কেন্দ্রের চার দেওয়ালে বন্দি। সেই সঙ্গে স্মৃতি ফলকে খোদিত রয়েছে তৎকালীন রানাঘাটের এস. ডি. ও-জে. সি. চ্যাটার্জী ও রানাঘাটের বি. এল. সি. ও-এ. এন. মুখার্জীর নাম।

১৮১২ সালে জন্মেছিলেন বাঙালী কবিয়াল রচনারীতির শেষ কবি ঈশ্বরগুপ্ত। জানা গেছে, মাত্র ৫ বছর বয়সে শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি মুখে মুখে 'রাতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কলকাতায় আছি' ছড়াটি রচনা করেছিলেন। তবে পরিণত বয়সে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। মাতুলালয়ে থাকাকালীন কলকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর মাতামহের দীর্ঘ পরিচয় সূত্রে তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন। এইভাবে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের নাতি যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। কবি ঈশ্বরগুপ্তের সম্পাদনায় ১৮৩১ সালে ২৮ জানুয়ারি যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক

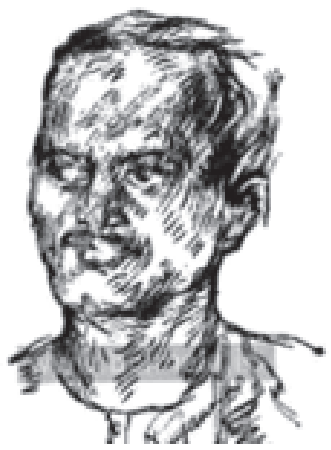

'সংবাদ প্রভাকর' পরে এটি বারত্রয়িক এবং ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন দৈনিকে পরিণত হয়। জানা গেছে। এই পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো গুণী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কবি ঈশ্বরগুপ্তের পৈতৃক ভিটেতে আজ এক স্মৃতিফলক ছাড়া তাঁর বাড়ির কোনও চিহ্নই নেই। কলকাতা অথবা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক তাঁর দু-একটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। এছাড়া দু-একটি ক্যুইজ পুস্তকে তাঁর নাম একটু আধটু দেখা গেলেও, নব প্রজন্মকে অবগত করার লক্ষ্যে কবির কৃতিত্ব প্রচারে কোনও উদ্যোগই নেয়নি রাজ্য সরকার, এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। আরও অভিযোগ কবির জন্মভিটে অযত্নে, অবহেলায়, সাপ-পোকামাকড়ের ডেরায় দায়সারা ভাবে জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। স্থানীয় সিপিএম নেতা রবি দত্ত জানান, কবির জন্মভিটেটিকে সংস্কার করে নবসাজে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে কবি প্রতিভা সম্পর্কে অবগত করানো অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন এই স্থানীয় সিপিএম নেতা। এখন প্রশ্ন বামফ্রন্ট সরকারের গালভরা প্রতিশ্রুতি কি 'বিশবাঁও জলে' গিয়ে পড়বে? তবে উত্তর মিলবে সময়ের প্রতীক্ষায়।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

রোজগারের পথ মোবাইল মেরামতি

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা থেকে শুরু করে আল কায়দা সুপ্রিমো বিল লাদেন থেকে কালিকাপুরের চা-বিক্রেতা কালুদা থেকে সাঁকরাইলের আনাজ-বিক্রেতা রসিদ মিঞা —মোবাইল সর্বত্র পূজ্যতে। যেহেতু যন্ত্র, তাই যন্ত্রণাও কম নয়। বিগড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। তখন করবেন কী? তারই হদিশ দিয়েছেন **নীল উপাধ্যায়।**

কচিকাঁচা, বুড়ো হাবড়া সকলের হাতে হাতে এখন মোবাইল ফোন। বড় সমস্যায় অগতির গতি 'সার্ভিস সেন্টার'। এই সব সার্ভিস সেন্টারে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। মোবাইলের ঘাতঘোঁত জানতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পাওয়া জরুরী। রিপেয়ারিং হোক বা সার্ভিসিং, প্রশিক্ষণ মাস্ট।

বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স থেকেই শেখাটা শুরু। এছাড়া ডিজিটাল, জি এস এম এবং সি ডি এম এ টেকনোলজি তো আছেই। সফ্টঅয়্যার ও চিপ লেভেল সার্ভিসিংও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের একটা অঙ্গ। সাধারণ কম্পিউটার জ্ঞানও প্রয়োজন।

প্রথমেই জেনে নিতে হয় মোবাইলের ভেতরকার নানাবিধ যন্ত্রপাতি সম্পর্কে। যেমন--- রেজিস্টরস, ক্যাপাসিটরস, জেনারেল ও স্পেশাল ডায়োড্স, ব্রেকডাউন ডিভাইসেস, অক্টো-ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসেস, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, প্যাকেজ ইত্যাদি। এই জানাটা শেষ হলেই শুরু হয় মোবাইল মেরামতির পাঠশালা। মোবাইল বিগড়ে যাওয়ার উৎস খুঁজে বের করা, সেটাকে বদলানো। আর বদলাতে গেলে জানতে হবে 'এস এম ডি' কী, 'বি জি এ'-ই বা কী। এছাড়া আছে হট্ এয়ারগান সোল্ডারিং স্টেশন, রিওয়ার্ক স্টেশন, আল্ট্রাসোনিক ক্লিনিং মেসিন ইত্যাদি। এরপর হ্যান্ডসেটের বিভিন্ন সফ্টওয়্যার সমস্যার সমাধান খোঁজা— সমস্যার কারণ কী, তার প্রভাবে কী কী ঘটতে পারে, সারাতে গেলে কী কী সাজ-সরঞ্জাম দরকার। হ্যান্ডসেট লক হয়ে গেলে কীভাবে ঠিক করা যায়, ইত্যাদি বিভিন্ন সফ্টওয়্যারই বা কীভাবে আপগ্রেড করা যাবে— এই বিষয়গুলিও প্রশিক্ষণের মধ্যে পড়ে। আই এম ই আই নম্বর কী, ফোন লক, সিম লক ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদে জানতে হয়ই। এসব সমস্যার সমাধানের একের পর এক ধাপ, কী কী যন্ত্রপাতির

(এরপর ১৩ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ২৯

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

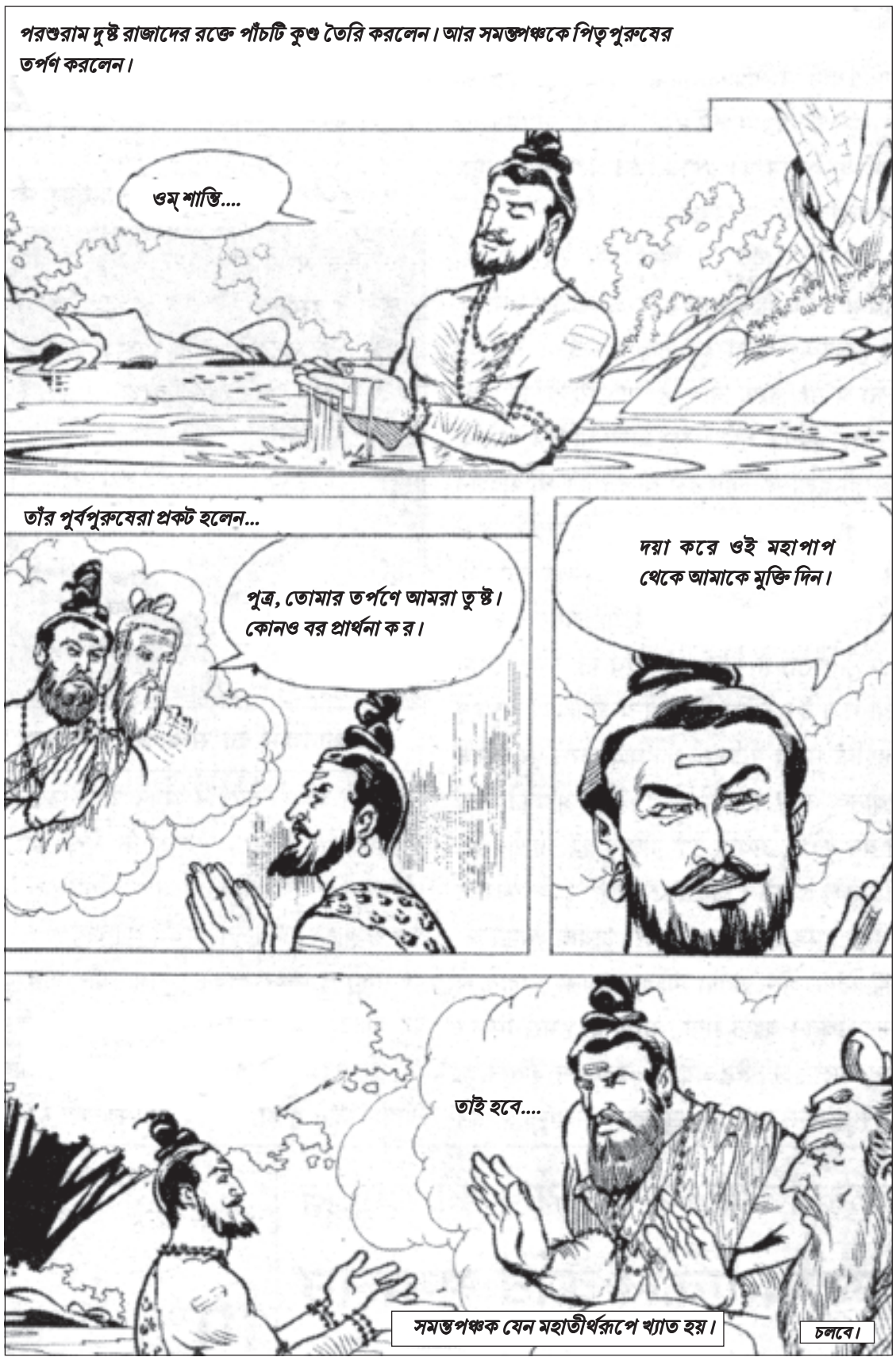

।। নির্মল কর।।

চোখ থেকে দুধ

'গিনেস বুক'এ নাম তুলতে মানুষ কী না করেন! মাহমিদ ইয়ালমিজ নামে এক তুর্কি নাগরিক তাঁর চোখ থেকে দু' মিটার দূরে পর্যন্ত অবিরাম দুধ বের করে 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এর প্রতিনিধিদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চোখের মধ্যে নিশ্চয় দুধের খনি নেই! এটা সম্ভব হয়েছে দীর্ঘদিনের বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনুশীলনে। প্রথমে নাক দিয়ে পরিমাণ মতো দুধ তুলে নিয়ে চোখ দিয়ে বের করে দেন।

হাঁচিতে বাঁচোয়া

কে বলে হাঁচি অলক্ষুণে? ইতালির সার্কো সানগারমানে অবশ্য মোক্ষম হাঁচিটি না দিলে তাঁকে আর বাঁচতে হোত না। নেপলস্-এ বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের রাতে কী করে যেন তাঁর নাকে একটা ২২ বোরের বুলেট এসে বিঁধেছিল। প্রাণঘাতী হতেই পারতো। কিন্তু হাসপাতলে চিকিৎসা চলাকালীন তিনি হাঁচলেন সেই মোক্ষম হাঁচিটি, বুলেটও বেরিয়ে গেল।

নোবেল রঙ্গ

ভালো খাওয়া-দাওয়া করুন, ছুটি উপভোগ করুন আর পারেন তো কিছু একটা নিয়ে গবেষণায় মেতে থাকুন। বাঁচতে হবে বেশিদিন। কারণ, নোবেল কমিটির স্বীকৃতি পেতে অন্তত ৫০ বছর লেগে যেতে পারে। আত্মজীবনীতে কথাগুলো লিখেছেন ১৯৯৬-এর নোবেল জয়ী অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী পিটার ডোহার্ট।

নরখাদক

ছাব্বিশ বছর বয়সী ইউক্রেনীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামার সেরগেই ঝমারইভ তাঁর বৃদ্ধা ঠাকুরমার শরীর থেকে ভাঙা কাচ দিয়ে একে একে খুবলে নেয় তাঁর চোখ কান জিভ আর ঠোঁট। তারপর সেগুলোতে মশলা মাখিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে নেয়, আর যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মারা যান ঠাকুরমা। এই বিকৃতমনা কীর্তিমান খাদক এখন শ্রীঘরে।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক ঃ বল্, গৌরব মানে কী?

ছাত্র ঃ গোরুর রব।

শিক্ষক ঃ তার মানে?

ছাত্র ঃ স্যর, গৌ মানে গোরু, রব মানে আওয়াজ— দু'এ মিলে গৌরব।

* * *

শাশুড়ি (নূতন বউকে আড়ালে ডেকে) ঃ শোন বৌমা, এখন থেকে আমাকে 'মা' আর শ্বশুরমশাইকে 'বাবা' বলে ডাকবে।

নতুন বৌ (রাতে স্বামী ফিরলে) ঃ মা, দাদা ফিরেছে।

* * *

প্রশ্ন ঃ দস্তানা কাকে বলে?

উত্তর ঃ দশ জনের আস্তানাকে।

* * *

বোন ঃ একী দাদা, আমাকে সম্পত্তির সিকি ভাগ দিলে যে!

দাদা ঃ বাকি সিকি ভাগ ছোটকে দেব বলে!

বোন ঃ কিন্তু তুমি জাননা, সিকি পয়সা অচল হতে চলেছে?

* * *

বিনু ঃ কীরে, বইমেলায় যাবি না?

তিনু ঃ না বাবা, বইমেলার গোটাটাই মশারা ফুডপার্ক বানিয়ে রেখেছে।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। সেকালে নারীর ভূমিকায় যে-পুরুষরা অভিনয় করতেন, তাঁদের কী বলা হোত?

২। ইয়োরোপীয় সংগীতস্রষ্টা মোৎসার্ট, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে মিল কোথায়?

৩। কাকে বলা হয় পঞ্চম বেদ?

৪। ইন্টারনেট জগতের মানুষ, যিনি এক যুগান্তকারী কাজ করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। কে তিনি?

৫। শুধু অমাবস্যার দিনেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। কথাটা ঠিক না ভুল?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। বেনেপুতুল

২। তিনজনেরই জন্ম জানুয়ারি মাসে

৩। মহাভারতকে

৪। উইকিপিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা জিমি ওয়েল্স

৫। ঠিক

কংগ্রেসের হাতে বাজেট আজ অবাস্তব কল্পকাহিনীতে পরিণত

এন সি দে

বাজেটের অভিধানগত অর্থ হলো ‘ব্যাগভর্তি বস্তু বা এক বান্ডিল খবর’। বাস্তবিক অর্থ হলো বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান এবং আয় অনুযায়ী বন্টন। অথচ কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার বাজেটকে করে তুলেছে এক অবাস্তব কল্পকাহিনীতে। ব্যাগভর্তি আছে বস্তুতে নয়, প্রতিশ্রুতিতে, যে প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আবার রয়েছে অজস্র পরিসংখ্যানগত গলদ। তবে সেসব তো আর ভারতবর্ষের সরল ও সাদাসিধে রাষ্ট্রীয় চেতনাহীন মানুষ খতিয়ে দেখে না, তাই রক্ষে। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ হলেই হলো। তাই বার্ষিক বাজেটকে কংগ্রেসীরা তাদের রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো বানিয়ে ফেলেছে। এটা কেন্দ্রীয় রেল ও অর্থ বাজেট— দুটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২০০৪ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের হাত থেকে শস্যপূর্ণ ভাণ্ডার আর মুদ্রাপূর্ণ কোষাগার পেয়েও আজ দেশের সমস্ত ভাণ্ডার আর কোষাগারকে শূন্য করে দিয়েছে এই কংগ্রেসী জোট সরকার। ২০,০০০ কোটি টাকা ধার করে ৫৭,০০০ কোটি টাকার বাজেট বানিয়েছেন রেলমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রীও আপাতত ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে ধার নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। এছাড়া রয়েছে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিক্রি করে ৪০ হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য।

কংগ্রেসের হাতে পড়ে আজ দেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে ঘাটতি। ব্যাঙ্কের আর্থিক ঘাটতি। ব্যাঙ্ক জমার চেয়ে ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে গেছে। ডিপোজিট-ক্রেডিট অনুপাত ১০২ শতাংশ। এই ডিপোজিট ঘাটতি মেটাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রতিদিন ব্যাঙ্কগুলিকে গড়ে ১,২০,০০০ কোটি টাকা দিতে হয়েছে গত ডিসেম্বরে। অক্টোবরেও এর পরিমাণ ছিল ৬২,০০০ কোটি টাকা। গত বাজেটেও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বরাদ্দ করেছিল ১৫,০০০ কোটি টাকা। এরপরে পুনরায় কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে ৬,০০০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হরির লুঠের মতো চলে যাচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে, যারা এ টাকা জাতীয় উৎপাদনে এক বিন্দুও লাগাচ্ছে না। যার প্রমাণ ব্যাঙ্কের বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ। যার পোশাকী নাম দেওয়া হয়েছে NPA অর্থাৎ এক ধরনের Asset যার বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই। ঋণ দেওয়ার আগে যা ছিল ব্যাঙ্কের Asset, ঋণ দেওয়ার পর তা হয়ে গেছে ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ীর Asset। এই NPA’র মোট পরিমাণ মার্চ, ২০১১’-র পর ১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছবে বলে অনুমান। মার্চ, ২০১০-এ এই পরিমাণ ছিল ৮৪,৭৪৭ কোটি টাকা; মার্চ, ২০০৯-এ ছিল ৬৮,৩২৮ কোটি টাকা। অতএব NPA’র পরিমাণ দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। এই বিপুল অঙ্কের NPA-কে ব্যাঙ্কগুলি প্রথমে bad loans হিসাবে ঘোষণা করে এবং পরে মুকুব করে দেয়। এর পিছনে চলে টাকার খেলা। ২০০৭-০৮ বর্ষে ২৬,০০০ কোটি টাকা মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে ব্যাঙ্ক ডিপোজিটে ঘাটতি, অন্যদিকে এই বিপুল অর্থের নয়ছয়।

ভারতীয় অর্থনীতির আর একটি লক্ষণীয় ঘাটতি হলো Current Account ঘাটতি। ২০০৬-০৭-এ এই ঘাটতি ছিল জাতীয় মোট উৎপাদনের (GDP)-১ শতাংশ; ২০০৭-০৮-এ বেড়ে হয় ১.৩ শতাংশ; ০৮-০৯-এ হয় ২.৪ শতাংশ; ০৯-১০-এ হয় ৩ শতাংশ আর ২০১০-১১-য় প্রথম তিন মাসেই এই ঘাটতি ব্যাপক হারে বেড়েছে।

কোনও দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য কেমন তা বোঝা যায় তার বাণিজ্যের প্রকৃতি দেখে। নিজ দেশের শিল্প সামগ্রী অন্য দেশে বিক্রি করলে অর্থাৎ রপ্তানী বাড়ালে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়, আবার অন্য দেশ থেকে শিল্পসামগ্রী কিন্‌লে অর্থাৎ আমদানি বাড়ালে দেশের অর্থ বিদেশে চলে যায়। একে বলে বাণিজ্যিক ঘাটতি। রপ্তানী না বাড়ালে বাণিজ্যিক ঘাটতি বেড়েই চলবে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার রপ্তানী বাড়ানোর নাম করে রপ্তানী শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে, কর ছাড় দিয়েছে কিন্তু ফল কি হয়েছে? কিছুদিন আগেও শিল্পোৎপাদন চলে গিয়েছিল শূন্যে। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোকে আর্থিক মন্দার হাত থেকে বাঁচাতে ওই দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি করে তাদের দ্রব্যসামগ্রী দেদার আমদানী ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে বাণিজ্য ঘাটতি। ১০-১১ বর্ষে এই ঘাটতি ১২৫ বিলিয়ন ডলার হবে বলে অনুমান। গত বর্ষেও ছিল ১১৭.৩৬ বিলিয়ন ডলার। বাজপেয়ি সরকার চলে যাওয়ার পর থেকে প্রতি বছর এই ঘাটতি বেড়েই চলেছে। ২০০৬-০৭ বর্ষে এই ঘাটতি ছিল ৬১.৪ বিলিয়ন ডলার।

এছাড়াও রয়েছে রাজস্ব ঘাটতি। রাজস্ব আদায়ের চেয়ে খরচ বেশি হওয়ায় হয় রাজকোষ ঘাটতি। এই রাজস্ব ঘাটতি কংগ্রেস সরকারের আমলে যেমন বছর বছর বেড়েই চলেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে রাজকোষ ঘাটতি। রাজস্ব ঘাটতি ২০১০-১১ (আর ই)-তে ধরা হয়েছিল ২,৬৯,৮৪৪ কোটি টাকা প্রকৃত কত হয়েছে তার হিসাব এখনও আসেনি। ২০১১-১২ (বি ই)-তে বেড়ে হচ্ছে ৩,০৭,২৭০ কোটি টাকা; বছরের শেষ দিকে আর ই-তে কত দাঁড়াবে অনুমান করাই যাচ্ছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজকোষ ঘাটতি। ২০১০-১১ (আর ই)-তে এই ঘাটতি ছিল ৪,০০,৯৯৮ কোটি টাকা; ২০১১-১২ (বি ই)-তে ধরা হয়েছে ৪,১২,৮১৭ কোটি টাকা। এই ঘাটতির ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে চলেছে ঋণের বোঝা। বর্তমানে এই ঋণের পরিমাণ ৩৩,০৬,৬২৬ কোটি টাকা, ২০১১-১২ বিত্তবর্ষে পুনরায় ঋণের প্রস্তাব করা হয়েছে ৪,১২,৯৮৬ কোটি টাকা। আর এর উপর রয়েছে বার্ষিক সুদের বোঝা। এর পরিমাণ হলো ২,৬৭,৯৮৬ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় অর্থ বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সরকারের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করাটা জরুরি। কার তা নাহলে কেউ কেউ ‘বলছে এই বাজেটে কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী তার ও তার সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিয়েছে। সত্যি কী তাই? আসুন দেখি।

যে সরকারের সবকিছুতেই ঘাটতি আর সেই ঘাটতি মেটাতে নিতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণ আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ঋণ, সেই সরকার এবারের বাজেটে স্বপ্ন দেখিয়েছে এবার ব্যয় বাড়বে মাত্র ৩.৪ শতাংশ; রাজকোষ ঘাটতিও কমে হবে বিজিপি’র ৪.৬ শতাংশ; অথচ ত্রয়োজশ অর্থ কমিশনের ঠিক করে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা হলো ৪.৮ শতাংশ। ২০১০-১১ বর্ষে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১১,০৮,৭৪৯ কোটি টাকা; বছরের ছয়মাস শেষ হতে না হতেই এই ব্যয় বেড়ে হয়ে যায় ১২,১৬,৫৭৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৃদ্ধি হয় প্রায় ১০ শতাংশ। তাহলে ২০১১-১২ বর্ষে এই ব্যয় কি করে মাত্র ৩.৪ শতাংশ বেড়ে হবে ১২,৫৭,৭২৯ কোটি টাকা। এটা অবাস্তব। শুধু পরিসংখ্যানের ভাওতাবাজী। কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে ভর্তুকি ব্যয় কমানোকে। গত ২০১০-১১ বাজেটেও তো ভর্তুকি ব্যয় ধরা হয়েছিল ১,১৬,২২৪ কোটি টাকা; অথচ ছয় মাস বাদেই আর ই-তে বাড়িয়ে করা হলো ১,৬৪,১৫৩ কোটি। আশ্চর্যজনকভাবে এবারের বাজেটে ভর্তুকি ব্যয় কমিয়ে ১,৪৩,৫৭০ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিতে সরকার স্থির থাকতে পারবে? স্থির থাকতে যে পারবে না তার লক্ষণতো এই বাজেটেই রয়েছে। আগামী সংসদ অধিবেশনে সরকার খাদ্য নিরাপত্তা বিল পাশ করাতে বদ্ধপরিকর। কম পয়সা অথবা বিনা পয়সায় চাল-গম দিতে গেলে ভর্তুকি কী বাড়বে না? এছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যে হারে বাড়ছে, এই খাতে ভর্তুকি ২৩,৬৪০ কোটিতে সীমাবদ্ধ রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। গতবারই এই খাতে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল ৩৮,৩৮৬ কোটি টাকা। এবার এর চেয়েও বেশি হতে বাধ্য। সারের দাম যেভাবে বাড়ছে এই খাতেও ভর্তুকি বাড়তে বাধ্য। এছাড়াও এবার সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১০০ দিনের বাধ্যতামূলক কাজের মজুরি দেওয়া হবে ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অতএব এই খাতেও সরকারের ব্যয় বাড়তে বাধ্য। কংগ্রেস সরকারের পরপর ৭টি বাজেটের ব্যয়ের ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে ব্যয় কোনওদিনই কংগ্রেস সরকার কমাতে পারেনি। পাঁচ রাজ্যে ভোটের আগে এটা রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো।

অর্থমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় ধাপ্পাটি হলো সামাজিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। তিনি এই খাতে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ সামাজিক কাজে পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় ব্যাপকহারে কমিয়ে দিয়েছেন। ছিল ৩৫,০৮৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হলো ২০,৮৬২ কোটি টাকা। এই দ্বিচারিতা রয়েছে বাজেটের আনাচে-কানাচে। এ শুধু ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ জাদুকর অর্থমন্ত্রীর জাদু-কাঠির ছোঁয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘটেছে এক ক্ষণিক সম্মোহন। সম্মোহন কেটে গেলেই মানুষ বুঝবে, কিন্তু ততদিনে কেটে যাবে ভোট।

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

(১২ পাতার পর)

প্রয়োজন হয়, কীভাবে মেরামত করতে হয় তা হাতে-কলমে শিখে নেবার প্রয়োজন। বিভিন্ন সংস্থার হ্যান্ডসেটের ভেতর যে সার্কিটগুলি রয়েছে, সেগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, ট্রাবলশ্যুটিং মোবাইল মেরামতির মূল কথা। প্রধান সার্কিটগুলি কী কী, সাধারণ কিছু সমস্যা হ্যান্ডসেট দেখেই ধরে ফেলা ইত্যাদি মোবাইল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণের গোড়ার কথা।

ব্যাঙের ছাতার মতোই আজ গজিয়ে উঠেছে মোবাইল সার্ভিস সেন্টারগুলো। কারণ, এত মোবাইল, খারাপও হচ্ছে কিন্তু সারাবে কে? বিভিন্ন নামজাদা কোম্পানির নিজস্ব সার্ভির সেন্টারে আছে বটে, কিন্তু ওয়ারেন্টি সময় শেষ হয়ে গেলে? সুতরাং মোবাইল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা চাকরি পেতেই পারেন বিভিন্ন সার্ভিস সেন্টারে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই লেগে পড়া যায়। এতো গেল চাকরির কথা। নিজস্ব ব্যবসাও গড়ে তোলা যায় সহজে। স্বল্প পুঁজিতে নিজস্ব মোবাইল সার্ভিস সেন্টার খোলা যেতে পারে। যে-হারে মোবাইলের ব্যবহার বাড়ছে, তাতে মোবাইল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের কাজের কোনও অভাব হবে না— সে চাকরিই হোক বা নিজের ব্যবসা।

কোথায় শিখবেন ঃ (১) IEES, যাদবপুর, সুলেখা। ফোন ঃ ৯৮৩১৫৪৪৬১৭ /৯৪৩৩৪৫৬৬৮৯— এখানে মোবাইল চিপ্ লেভেল ও সফ্‌টওয়্যারসহ ১০০ শতাংশ প্র্যাকটিকাল। (২) ডিজিকম, ২/৮০, দমদম স্টেশন রোড, জি টি আর ফটকের বিপরীতে, কলকাতা-৯৮। ফোন ঃ ৯৩৩০৯২৫৬২৩।

মোবাইল সেল সেন্টারগুলিতেও প্রশিক্ষণ সেন্টারের খোঁজ মিলতে পারে।

যন্ত্রণার রেল

(৬ পাতার পর)

রেলের অফিসারদের বশ করে রেখেছে পরিবহন লবি। ফলে ব্রডগেজ সম্প্রসারণের কাজ কখন সম্পন্ন হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রডগেজ সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে এসব কথা বলেন করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির নেতারা। তাঁরা বলেন, সড়ক পরিবহণ লবির স্বার্থেই পাহাড় লাইনে যাত্রী রেল পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটে থাকে। চাপে পড়ে রেল চলাচল স্বাভাবিক করা হলেও সড়ক পরিবহন লবিকে তুষ্ট রাখতেই একেকটি ট্রেনের যাত্রায় অস্বাভাবিক বিলম্ব করা হয়। ইদানীং নির্দিষ্ট সময়সূচি থেকে দশ-বারো ঘণ্টা দেরিতে একএকটি ট্রেন চলছে। হামেশাই যাত্রীবাহী রেল বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। ব্রডগেজ সম্প্রসারণের দাবিতে বরাক বিজেপি দিল্লিতে ধর্না দেওয়ার পর দলের নেতারা রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে এসব বিষয় তাঁর নজরে আনলে তিনি বলেন, এ কাজে অর্থের কোনও অভাব নেই। তবে ইঞ্জিনীয়ারদের কাজ করে যাওয়ার মতো পরিবেশ না থাকায় তাতে বিলম্ব হচ্ছে। রাজ্য সরকার ইচ্ছে করে কাজের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে না বলে বিজেপি নেতারা অভিযোগ করেন। যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা প্রায়ই অনিয়মিত থাকে এ খবর বিজেপি নেতাদের কাছ থেকেই জানতে পারেন রেলমন্ত্রী। এতে যথেষ্ট বিব্রতবোধ করেন তিনি। বিধানসভা ভোট সামনে রেখে দিল্লিতে ধর্না দেওয়ার কথা উড়িয়ে দেন জেলা বিজেপি নেতারা। অনেক আগে থেকেই ক্রমান্বয়ে রেলের দাবি-দাওয়া নিয়ে করিমগঞ্জ, বদরপুর, মালিগাঁওয়ে দলের ধর্না পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন তাঁরা। করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি জ্যোতির্ময় দাস জানান, ব্রডগেজ সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করা সহ দশ দফা দাবির ভিত্তিতে জেলভরো আন্দোলন করেছে বিজেপি। উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে জেলা- ভিত্তিক জেলভরো আন্দোলন পালন করা হয়েছে। অন্যান্য দাবির মধ্যে আছে— জাতীয় সড়ক সহ জেলার বিধ্বস্ত পূর্ত সড়কগুলির দ্রুত সংস্কার, জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, ডি ভোটারদের হয়রানি বন্ধ করা প্রভৃতি।

মাতৃশক্তিই বিজয়িনী সংস্কার ভারতীর অনুষ্ঠানে

মাতৃশক্তি সম্মেলনে বক্তৃতারত নীলাঞ্জনা রায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ৫ মার্চ ২০১১ শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার রামমোহন হলে সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গের মহিলা সদস্যারা একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন— শীর্ষক 'বিজয়িনী মাতৃশক্তি'।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্ত। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সংগ্রহালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ঘোষ। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ঘোষণা ও বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় বলেন যে ব্যক্তিজীবনে মাতৃশক্তির ভূমিকাকে স্মরণ করেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যুবমানসের সংস্কার সাধন এবং তাদের ভারতের ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার এক প্রয়াস সংস্কার ভারতীর প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং সেইক্ষেত্রে পরিবারে ও শিশু শিক্ষায় মায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মহিলা সদস্যাদের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানান। এই প্রসঙ্গে জীজামাতা, শ্যামাপ্রসাদ এবং সুভাষচন্দ্রের জননীর কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেন।

শ্রীমতী সিদ্ধান্ত তাঁর বক্তব্যে সংস্কার ভারতীর আদর্শের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং মাতৃশক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ঘোষ রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কসবা শাখা আয়োজিত 'মা-সারদা' অবলম্বনে একটি সঙ্গীতালেখ্য ও বাগুইহাটী শাখার সঙ্গীতানুষ্ঠান সময়োপযোগী ছিল। শ্রীমতী রূপশ্রী দত্ত এবং শ্রীমতী সবিতা দত্তের একক কণ্ঠ অনুষ্ঠান দু'টিতে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল।

নারী শিক্ষার প্রচলন হবার পূর্ববর্তী সময়ের অন্তঃপুরচারিণী অথচ মানসিকভাবে অত্যন্ত প্রগতিবাদী দুই মহিলার কথা এই সন্ধ্যায় তুলে ধরা হয়— একজন— বিভাদেবী, অন্যজন রামসুন্দরী দেবী। প্রসঙ্গত বিভাদেবী ছিলেন শ্রীমতী উমা সিদ্ধান্তের মাতৃদেবী। তাঁর লেখা কয়েকটি গানের সংকলন ও ভাষ্যসহ একটি আলেখ্য পরিবেশন করেন বেহালা শাখার শিল্পীরা। শ্রীমতী অনুপা দাসের ভাষ্যরচনা ও পাঠ এবং শ্রীমতী কাকলী সেনের সুরারোপিত গানগুলির মধ্যে দিয়ে বিভাদেবীর স্বদেশভক্তি ও গভীর জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে। রামসুন্দরী দেবী হলেন প্রথম নারী, যিনি নিজের আত্মজীবনী লিখেছিলেন, যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল শিক্ষা অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয়। রামসুন্দরী দেবীর জীবনীটির কয়েকটি খণ্ডচিত্র নিয়ে পরিবেশিত হলো শ্রুতিনাটক 'বিজয়িনী'। পরিবেশনায় সংস্কার ভারতী, দক্ষিণ কলকাতা শাখা। নাট্যরূপ দিয়েছেন স্মিতশ্রী চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত বিবাহ দৃশ্যের বর্ণনায় গাত্রহরিদ্রার গানের প্রয়োগ ও তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টি ছিল প্রশংসনীয়।

এই দিনের সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক পর্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত সাম্প্রতিক বিষয় ছিল 'কন্যাভ্রূণ হত্যা'। ব্যাণ্ডেল শাখা কন্যা সন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের নির্যাতিতা হওয়া এবং কন্যা সন্তানের অবহেলার দৃশ্যটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে তুলে ধরতে পেরেছে। অন্যদিকে এই নারীই দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক হয়ে 'ঝাঁসী-রাণীর' রূপ নিতে পারে, সেটিও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এই স্বল্প পরিসর নৃত্য-নাট্যাংশটিতে। শ্রীমতী গৌরী সেনগুপ্তের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানের দিন প্রেক্ষাগৃহে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের মাতৃশক্তি প্রমুখ ও সহ প্রমুখ যথাক্রমে মঞ্জুলী ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, প্রাদেশিক কার্যকরী উপদেষ্টা পূর্ণচন্দ্র পুইতণ্ডী, পূর্বাঞ্চল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্য, অখিল ভারতীয় সহ-নাট্য প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য, সহ-সংগঠন প্রমুখ আমীরচাঁদজী সহ প্রাদেশিক কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শব্দরূপ-৫৭৬

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১				২	
৩			■	■	■		■
৪	■	৪		৫			■
৬	৭	■	■				■
■			৮	■		৯	১০
■			১১		১২	■	
■		■	■	■	১৩		
১৪						■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শঙ্করাচার্যের প্রতিযোগী মণ্ডনমিশ্রের বিদুষী ভার্যা, **৩.** পশমী শীতবস্ত্র বিশেষ, **৪.** কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের ভগিনী, **৬.** দেহ, শরীর, **৯.** শত্রু, লগ্নের ষষ্ঠ স্থান, **১১.** প্রাচীন বন্যজাতি, ব্যাধ, **১৩.** যযাতির পিতা, **১৪.** চান্দ্র-বৈশাখের শুক্লতৃতীয়া।

উপর-নীচ ঃ ১. সংগীতের নিম্ন স্বরগ্রাম, **২.** কৈলাসপর্বত, প্রথম তিনে রৌপ্য, **৩.** মহোৎসব (বৈষ্ণবের), **৫.** নামের পূর্বে যোজনীয় সম্মানসূচক উপাধি, **৭.** বিষ্ণু, **৮.** ছোট পোকা, **১০.** বিষ্ঠা, **১২.** দুহিতা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৭৪

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
জয়দীপ দে
বেলেঘাটা, কলকাতা-১০

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

■	ব্যো	■	ম	■	ত	ম	সা
■	ম	ছ	ব	■	ড়	■	কা
প্র	■	■	ল	ম্পি	কা	■	রো
জ্ঞা	ন	যো	গ	■	■	■	পা
পা	■	■	■	কা	লি	দা	স
র	■	মে	ঘ	না	■	■	না
মি	■	ন	■	মা	রু	তি	■
তা	ড়	কা	■	ছি	■	থি	■

● ৫৭৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ এপ্রিল, ২০১১ সংখ্যায়

'চলো পাল্টাই'-এর একটি দৃশ্যে দেবদান ও তাথৈ।

চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বকে উস্কে দিয়ে গেল 'চলো পাল্টাই'

বিকাশ ভট্টাচার্য

মুম্বাইতে অনেক প্রযোজক-পরিচালক বাস্তবজীবনের ঘটনা নিয়ে ছবি করছেন। বাংলায় অবশ্য একদমই সেইদিকে কেউ পা বাড়ায়নি। আশার কথা সম্প্রতি বেশকিছু প্রযোজক-পরিচালক বাস্তবজীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে ছবি করছেন। যার মধ্যে বাণিজ্যিক ছবির সফল পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক ছবি 'চলো পাল্টাই' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বছরখানেক আগে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনা অনুসরণে এই ছবি। প্রায় সব বাবা-মাই চান তাদের সন্তান মস্ত অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা রিসার্চ স্কলার হবে। গরীব বাবা-মাও ওভারটাইম খেটে, উপরি আয় করে ছেলেমেয়েদের সেইভাবে গড়ে তুলতে চান। তাদের সন্তান স্কুলে-কলেজে 'টপার' হবে। কারণ 'টপার' ছাড়া জীবনে সাফল্যের মুখ দেখা যায় না। কিন্তু তাদের ভাবনায় ছেলেমেয়ের ভাবনা বা স্বপ্ন মেলে কি? বাবা-মা কি জানেন ছেলে কি চায়? সে তো অন্যভাবেও জীবনে সফল হতে পারে। অনেকে তো হচ্ছেও।

চলো পাল্টাই-তে এমনই এক স্বপ্ন দেখা বাবা প্রসেনজিৎ-এর ছেলে দেবদান। দেবদান কিন্তু স্বপ্ন দেখে ক্রিকেটার হওয়ার। সম্ভাবনাও আছে তার মধ্যে। কিন্তু বাবা কিছুতেই চান না ছেলে পড়াশোনা ফেলে ক্রিকেট খেলে বেড়াক। বাবা-ছেলের সংঘাত ছবিকে এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। বাবা ছেলের খেলার ব্যাট ভেঙ্গে দেন। ছেলে রুখে দাঁড়ায়। বাবার হাতে প্রচণ্ড মার খায়। শেষপর্যন্ত এক চরম পরিণতির দিকে গোটা ঘটনাটা চলে যায়। যা কোনও বাপ-মা-ই চান না।

শোনা যাচ্ছে 'চলো পাল্টাই'-এর পুরোটাই প্রায় মারাঠি থিয়েটার থেকে নেওয়া। সে যাইহোক, হরনাথ চক্রবর্তী এমন একটা টানটান ছবি আমাদের উপহার দেবেন ভাবাই যায় না। এ ছবিতে আমরা যেন এক অন্য পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীকে পাই। টানটান চিত্রনাট্য। প্রথমার্দ্ধ তো মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। মাঝে শুধু পেটে বোমা বেঁধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে পাল্টানোর ব্যাপারটা হাস্যকর। তেমনই হাস্যকর এক বাংলা নিউজ চ্যানেলের বোকা বোকা টক শো। তবু শেষে এসে পরিচালক আবার ছবির রাশ টেনে ধরেছেন।

প্রসেনজিৎ এক অন্য ধরনের লুক নিয়ে, অন্য ধরনের অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সোচ্চার অভিনয় আর মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার চেঁচামেচি বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। তবে এটুকুই যা খামতি। ছেলের ভূমিকায় আদিত্য অ্যাকডেমির ক্লাশ টুয়েলভ-এ বিজ্ঞানের ছাত্র দেবদান ভৌমিক যেন চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেছে। সেটা অবশ্য সে চরিত্রের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে বলেই হয়তো। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে মেধাবী ছাত্র দেবদানের ফ্যাশন হলো অ্যাক্টিং। তাই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকেই ক্যারাটের পাশাপাশি ডান্স ট্রেনিং নিয়ে নিজেকে যোগ্য অভিনেতারূপে গড়ে তুলছে। গতানুগতিক বাংলা ছবির সুর থেকে অন্যধারার সুর করেছে অটোগ্রাফখ্যাত অনুপম। ভেক্টটেশ ফিল্মস-কে ধন্যবাদ— এ ধরনের 'অফবিট' একটা ছবি করার জন্য। সেইসঙ্গে অনুপম, দেবদান ও তাথৈ-দের মতো নতুন প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সুযোগ দেওয়ার জন্য। আবার ধন্যবাদ জানাই পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীকে।

দেগঙ্গার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করুন

দলমত নির্বিশেষে হিন্দুদরদী প্রার্থীদের ভোট দিন

শিবাজী গুপ্ত

লিস্টি বেরিয়েছে! লিস্টি বেরিয়েছে! যেন পশ্চিমবঙ্গকে ২৯৪ খণ্ডে ভাগ করে ২৯৪টি শকুনের সামনে এক টুকরো করে দেয়া হয়েছে। এবার খা তোরা কামড়াকামড়ি করে। তা টুকরা প্রতি তো শুধু একজন নয়। দুজন তিনজন বা কোথাও চারপাঁচ জনও। আগামী দেড় মাস ধরে যে যেখানে পারবি বঙ্গমাতার অঙ্গখানাকে খান খান করে এরা খেয়ে ফেলবে। এর মধ্যে যা দেখার তা হলো দুই যুযুধান পক্ষই প্রায় ৬০ জন করে মুসলমান প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে এ বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের অবোধ নির্বোধ হিন্দুদের নজরে পড়েছে বলে মনে হয় না। কারণ এদের মতো ছাগলা-বুদ্ধি মানুষ বিশ্বভুবনে আছে বলে মনে হয় না। এদের সঙ্গে তুলনা চলে কসাই-এর দোকানে সারি দিয়ে বাঁধা পাঁঠা - খাসির সঙ্গে। কসাই একটা একটা করে পাঁঠা-খাসি নিয়ে আড়াই পৌঁচে জবাই করে; আর বাকীগুলি মনের সুখে নির্বিকারভাবে কাঁঠালপাতা চিবায়— ক্ষণেক পরেই যে তাদের গলায়ও ছুরি বসাবে তা বোঝার মতো বোধ শক্তি তাদের নেই।

বাঙালী হিন্দুরও একই রকম ছাগলাদ্য দশা। একটা একটা করে বিধানসভা লোকসভা কেন্দ্র যে তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তাও তাদের নজরে আসে না।

১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলমান সদস্যের সংখ্যা ৫-৬ জনের বেশি ছিল না। তারপর থেকে প্রতিটি নির্বাচনে সে সংখ্যা বাড়তে বাড়তে গত বিধানসভায় ৪৫ জনে এসে দাঁড়ায়। এবারে বামফ্রন্ট ৫৬ জন মুসলমান প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী ৪২ জন মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। তার নির্বাচন সঙ্গী কংগ্রেস অন্তত জনা পনেরো প্রার্থী যে দেবে এ কথা নিশ্চিত। সুতরাং দুই পক্ষই প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি আসনে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছে। তার মানে যে অন্তত ৫০ টি আসন হিন্দুদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বা গেছে সে কঠোর কঠিন ও নগ্ন সত্যটি উপলব্ধি করার মতো বাস্তব বুদ্ধি ও বাঙালী হিন্দু হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে যে কি ভয়ঙ্কর দিন ঘনিয়ে আসছে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও যারা দেখতে না পায়, বুঝিয়ে দিলেও না-বোঝার ভান করে, তাদের সঙ্গে আর কসাই-এর দোকানের জবাই হবার অপেক্ষারত কাঁঠালপাতা চিবানো পাঁঠা-খাসির তফাৎ কি?

কোন দল কতগুলি আসন মুসলমানদের জন্য রিজার্ভ রাখবে তার কম্পিটিশন্ চলছে যেন। নামে হিন্দু পরিচালিত বামফ্রন্ট ও তৃণমূল ফ্রন্ট নামে দুটি ফ্রন্ট হলেও এদের লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু একই। তা হলো হিন্দুদের মাথায় বাড়ি মেরে মুসলমানদের তেলা মাথায় তেল দেওয়া। হিন্দুদের আসন কমানো এবং মুসলমানদের আসন বাড়ানো। পাঠক একবার দুই জোটের প্রার্থী তালিকা দু'টির দিকে নজর করে দেখুন। কংগ্রেস আমলে যে সব জেলা থেকে কখনও কোন মুসলমান বিধানসভায় জিতে আসতে পারেনি, এখন সেসব জেলা থেকে কেমন তরতরিয়ে মুসলমানরা জিতে আসছে। মেদিনীপুর, দক্ষিণ-২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও দুই দিনাজপুর— এই সীমান্তবর্তী জেলাগুলির সীমান্ত সন্নিহিত কেন্দ্রগুলি থেকে এককালে হিন্দু সদস্যরা ভোটে জিতেছিলেন; আর বর্তমানে সেসব কেন্দ্রগুলি সব অলিখিত-ভাবে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। তারপরে বীরভূম, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী ও কলকাতার বুকেও —যেখান থেকে কস্মিনকালেও মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হতে পারত না— সেখান থেকে গণ্ডা গণ্ডা আসনে মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছে, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল ফ্রন্টের বদান্যতায়— কমছে হিন্দুদের আসন।

বামফ্রন্টের লিস্টি থেকে দেখতে পাচ্ছি ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দল নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন জেলায় মুসলমান প্রার্থীকে টিকিট দিচ্ছে এবং হিন্দুদের বলছে তাদের ভোট দিতে— কোচবিহার-১, উত্তর দিনাজপুর-৪, দক্ষিণ দিনাজপুর-৯, মালদা-৫, মুর্শিদাবাদ-১৫, নদীয়া-৩, উত্তর ২৪ পরগণা-৫, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৪, কলকাতা-২, হাওড়া-৩, হুগলী-২, পূর্ব মেদিনীপুর-১, পশ্চিম মেদিনীপুর-২, বর্ধমান-৫, বীরভূম-৩ মোট-৬৪।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে পাবেন সত্তর দশকের আগে অর্থাৎ বামমার্গীরা ক্ষমতার অলিন্দে ঢোকার আগে এসব আসন থেকে ১০-১২ জনের বেশি মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হতে পারেনি। কিন্তু বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মাত্রাতিরিক্ত মুসলিম তোষণ, অনুপ্রবেশ, অস্বাভাবিক জন্মহার, জালভোট ও হিন্দুদের মাথায় সেকুলারিজমের বীজ ঢুকিয়ে পঞ্চাশের অধিক আসনে মুসলমান সদস্য নির্বাচনের পথ পরিষ্কার করেছে। হিন্দু ভোটারগণ রাজনৈতিক দলের নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজের বংশধরদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ওই সকল কেন্দ্রে দলবদ্ধভাবে দলমত নির্বিশেষে হিন্দু প্রার্থীদের ভোট দেন তাহলে বিধানসভায় মুসলিম সদস্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য কমে যাবে এবং হিন্দুপ্রার্থীদের আর মুসলিম ভোটের জন্য তোয়াজ করতে হবে না।

হিন্দু ভোট তিন চার ভাগ করে এবং মুসলিম ভোট অবিভক্ত রাখার ফলেই এতোগুলি বিধানসভা আসন হিন্দুদের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চাবিকাঠি মুসলমানদের হাতে চলে যাচ্ছে। আর তার ফলে কি শহরে, কি গ্রামে, হিন্দুরা চুরি ছিনতাই ডাকাতি রাহাজানির শিকার হচ্ছে। হিন্দু মেয়েদের পথেঘাটে চলাফেরা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অপহরণ, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। খাস পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-গ্রামান্তরে মানসম্মান নিয়ে বসবাস করা হিন্দুদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে— ক্ষেত্রবিশেষে বাংলাদেশের চেয়েও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সসম্মান বসবাস দুরূহ হয়ে উঠেছে। মুসলিম ভোট-লিপ্সু হিন্দু নেতাদের কাছে কোনও প্রতিকারেরই আশা নেই।

এখন একমাত্র বাঁচবার পথ— মুসলিম প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রগুলির হিন্দু ভোটারদের হয়ে ভোট যাতে ভাগ না হয় তা দেখা এবং একজোট হয়ে একজন হিন্দুদরদী প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনা। তা না হলে শিরে সর্পাঘাত; তাগা বাঁধার জায়গা থাকবে না।

জমি অধিগ্রহণ আইন : ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে

গোপীনাথ দে

এখানে জমি অর্থে কৃষি-জমি, আর কৃষি-জমি নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয় ১৬০১ খৃস্টাব্দে সম্রাট আকবরের আমলে। জমি নথিভুক্ত করার কারণ মোটামুটি ছিল দু'টি— (১) জমির মালিকানা ঠিক করা (২) এবং সেই জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা। আইন-ই-আকবরীতে এসবের বিস্তারিত বিবরণ থাকলেও জমি অধিগ্রহণ জাতীয় কোনও আইনের উল্লেখ নাই। কারণ জমি থেকে রাজস্ব আদায় করাই ছিল মুঘল সম্রাটদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আমলে শিল্পভিত্তিক ঔপনিবেশিক ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে গেলে প্রচুর জমির প্রয়োজন; আর সেই কারণেই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনে হয়েছিল জমি অধিগ্রহণ আইন। তারই ফল স্বরূপ ১৮৯৪ সালে ইংরেজ শাসনে জমি অধিগ্রহণ আইন পাশ হয়। যা আজও স্বাধীনতার প্রায় ৬৪ বৎসর পরেও টিকে আছে। বৃটিশ আমলের প্রায় সব আইনই ছিল প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে শাসন ও শোষণের হাতিয়ার। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার ৬৪ বৎসর পরেও ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইনের পরিবর্তন ঘটানোর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ডান-বাম কোনও সরকারেরই নেই।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রই ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের অধীনে ছিল এবং সেই ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন বলবৎ ছিল। ওই দুই রাষ্ট্র ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে গেলেও ওই আইনই আজও বলবৎ আছে। তারাও ওই আইনের পরিবর্তন করেনি। কারণ তাদের ওখানে জমি অধিগ্রহণ সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠেনি। কারণ হিসাবে বলা যায় দুটি কারণ (১) পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ইত্যাদি যারা সংখ্যায় প্রায় ২৫ শতাংশ ছিল তারা প্রায় সকলেই উদ্বাস্তু হয়ে জমি, ঘর বাড়ী ফেলে রেখে ভারতে চলে এসেছে। এখন তারা প্রায় ১ শতাংশ মাত্র পাকিস্তানে আছে। অর্থাৎ ওইসব হিন্দু- বৌদ্ধ, খৃস্টানদের ফেলে আসা জমি-বাড়ি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত করে রাষ্ট্র দখল করেছে। ফলে অঢেল সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকায় শিল্পায়ন বা নগরায়ণ ইত্যাদির জন্য জমি অধিগ্রহণ সমস্যাটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। অপরদিকে বাংলাদেশেও স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রায় ৪৮ শতাংশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ছিল। এখন মাত্র ৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষের জমি- ঘরবাড়ী শত্রু সম্পত্তি হিসাবে বাংলাদেশ সরকার পেয়ে গেছে। তাই শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সমস্যাটা প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি।

জাপান ঃ জাপানে কৃষি জমির পরিমাণ খুব কম সেই তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি। অথচ আমরা জানি জাপান শিল্পোন্নত দেশ। জাপানে কুটীর শিল্প ছোট-বড় সব ধরনের শিল্প আছে। কয়েকটি ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে জাপান রাষ্ট্র। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ৫০ বৎসর আগে জাপান সরকারের ''জিনটৎসুগাওয়া'' অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু জাপান সরকার ঠিক করেছিল জমি অধিগ্রহণ করবে না। তখন জাপান সরকার বাঁধ নির্মাণকারী কোম্পানী ও জমির মালিকদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করেছিল— জমির মালিক তাদের জমির মালিকই থাকবে। তারা শুধু তাদের জমি বাঁধ তৈরির জন্য দীর্ঘমেয়াদি লিজ দেবে। লিজ দেওয়ার জন্য দুটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল। এক— জমির মালিকরা কোম্পানির কাছ থেকে এককালীন কিছুটাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। দুই— জমির মালিকরা পুরুষানুক্রমে লিজ বাবদ প্রতিমাসে মাসোহারা ভাড়া হিসেবে পেয়ে যাবে। এই ব্যবস্থায় সব জমির মালিকই সম্মতি জনায়।

চীন ঃ চীন সরকার ১৯৮০ সালের আগে কয়েকটি বাঁধ ও জলাধার তৈরি করে। জিনান জিয়াং, সামসেঙজিয়া ও দাস- জিয়ানগকৌউ; এই তিনটি বড় বাঁধ তৈরির ফলে প্রায় নয় লক্ষ মানুষ বাস্তু ও কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ হয়। ফলে জনসাধারণের বিক্ষোভ ও রাজনৈকি অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই কারণে চীন সরকার পুনর্বাসন সংক্রান্ত আইন ও নীতি প্রণয়ন করতে শুরু করে। ১৯৮৫ সালে চীন সরকার পুনর্বাসন পরবর্তী উন্নয়ন তহবিল গঠন করে। জমি থেকে যারা উচ্ছেদ হবে তাদের নতুন জীবিকায় প্রবেশের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার জমা করতে শুরু করে। এবং ১৯৮৬ সালে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন পাল্টানো হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে আইন করে পুনর্বাসনকে সরকারের অবশ্য করণীয় দায়িত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ব্রাজিল ঃ বিরাট দেশ ব্রাজিল। শিল্পায়নের জন্য বড় বড় বাঁধ তৈরি ব্রাজিলের একান্ত প্রয়োজন। বড় বাঁধ তৈরি মানেই উচ্ছেদ এবং জমি জায়গা অধিগ্রহণ। সেই কারণে কয়েকটি বড় বাঁধ তৈরির ফলে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের ভিড়ে শহরগুলির গায়ে গায়ে হাজারে হাজারে বস্তি গড়ে ওঠে। আর এইসব বস্তিবাসী মানুষগুলির জন্য ব্রাজিল সরকার সংবিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৮৮ সালে; বাঁধ থেকে জলবিদ্যুৎ বিক্রির লভ্যাংশ উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের উন্নয়নের জন্য বন্টনের ব্যবস্থা করে। উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলি ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়াও জলবিদ্যুৎ বিক্রির লভ্যাংশ নিয়মিত পেয়ে থাকে।

কানাডা ঃ কানাডা শিল্পে উন্নত দেশ। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গুরুত্ব দেয়। আর সেইজন্য ১৯৭১ সালে ২০টা বিশাল বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে জেমস বে নামে এক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রকল্প। কিন্তু বাদ সাদে কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং এস্কিমোদের একটি অংশ। এদের বহু জমিজমা হারাবার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। ফলে তারা আন্দোলন ও মামলা আরম্ভ করে। ফলে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে, সরকারপক্ষ, জমির মালিক ও 'জেমস বে' প্রকল্প নির্মাণকারী হাইড্রো কুইবেক কোম্পানী; ঘোষণা করে যে সমস্ত আদিবাসীদের জমি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বাঁধ তৈরির কাজে অধিগ্রহণ করা হবে তাদের মূলধন লগ্নিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অতএব প্রকল্পের জন্য ভূমিহারা প্রতিটি পরিবার এককালীন ক্ষতিপূরণ তো পাবেনই উপরন্তু দীর্ঘকাল ধরে ওই পরিবারগুলি কোম্পানীর লাভের অংশ অনুপাতিকহারে পাবেন।

নরওয়ে ঃ উন্নত দেশ এবং তুলনায় জনসংখ্যা কম। তবুও বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী শিল্পস্থাপনের জন্য কৃষি ও বাস্তুজমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্য ১৯৯৭ সালে নরওয়ে সরকার বিদ্যুৎ কর আইন চালু করে। ওই আইন বলে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি তাদের লাভের ২৮ শতাংশ টাকা সরকারকে দিয়ে দেবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ-এর ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ বিনামূল্যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দিয়ে দিতে থাকবে দীর্ঘদিন যাবৎ।

বিভিন্ন দেশে যখন কৃষি ও কৃষককে বাঁচিয়ে শিল্পায়ণে গতি বৃদ্ধি করছে তখন আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বিশেষ করে ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশে, কৃষিকে বাদ দিয়ে বা কৃষককে বঞ্চিত করে শিল্পে গতি আনার কথা ভাব অনেকটাই মূঢ়তা। বরং আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় কৃষির আরো উন্নয়ন দরকার এবং কৃষকের জন্য আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাগজ, ছাপার খরচ, পত্রিকা পাঠানোর খরচ, পত্রিকা প্রকাশের আনুষঙ্গিক খরচ প্রভৃতি ক্রমাগত বেড়ে চলার জন্য স্বস্তিকা'র মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে পত্রিকা প্রকাশের খরচ বেড়ে চলা সত্ত্বেও স্বস্তিকা'র দাম বাড়ানো হয়নি। এবার অনেকটাই নিরুপায় হয়ে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হলো। নচেৎ পত্রিকার প্রকাশনা অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে।

আগামী ১৮.০৪.২০১১-র সংখ্যা অর্থাৎ নববর্ষ - ১৪১৮-র সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র পরিবর্তিত মূল্য নিম্নলিখিত হারে প্রযোজ্য হবে ঃ

সাধারণ সংখ্যা ৪ টাকার পরিবর্তে ৫ টাকা হবে।

পূজা সংখ্যা এবং অন্যান্য বিশেষ সংখ্যার মূল্য যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত করা হবে।

বার্ষিক গ্রাহক (অন্তর্দেশীয়) মূল্য ২০০ টাকার পরিবর্তে ২৫০ টাকা হবে।

বার্ষিক গ্রাহক (বহির্ভারত) মূল্য অপরিবর্তিত থাকবে।

পরিবর্তিত মূল্যের কারণে আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত কিন্তু অনন্যোপায়। আমরা বিশ্বাস করি, বিগত দিনের মতো আগামী দিনেও পৃষ্ঠপোষকগণ স্বস্তিকা'র প্রচার ও প্রসারে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন।

— স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

Swastika
28 March - 2011, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

ময়ূরেশ্বরে আশায় বুক বাঁধছে বিজেপি

বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পশ্চিমবঙ্গে যে কয়েকটি বিধানসভা আসনে তথ্য, যুক্তি ও বাস্তবতার দিক থেকে বিজেপি সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর উল্লেখযোগ্য। বিগত চার-পাঁচটি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী এখানে বেশ ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সুভাষচন্দ্র মণ্ডল ২৯,৮১৩ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। যা ছিল প্রদত্ত ভোটের ২৭.২ শতাংশ। যদিও তা সিপিএম-এর জয়ী প্রার্থীর ধারে কাছে ছিল না। সিপিএম প্রার্থী সাধু বাগদী গতবার ৬১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হলেও তারা এবার মানসিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ২০১১-এর নির্বাচনের আগে এলাকা পুনর্বিন্যাসের ফলে ময়ূরেশ্বর এখন আর সংরক্ষিত নয়, সাধারণ। এটা অন্যদের পক্ষে অসুবিধা হলেও বিজেপির পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছে। দু'দফার ময়ূরেশ্বরের অঞ্চল প্রধান দুধকুমার মণ্ডল এবার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী। দু'বারের অঞ্চল প্রধান হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ সামলেছেন। দীর্ঘদিন এলাকায় বিভিন্ন গণ-আন্দোলনে সহকর্মীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রার্থীপদ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই দলের কোনও মহলেই। দলের পক্ষ থেকে প্রথামাফিক ঘোষণা হওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রধানমশাই নির্বাচনী ময়দানে দলবল নিয়ে নেমে পড়েছেন। এখানে দুধকুমার মণ্ডল-এর একটু পূর্ব পরিচয়ও দেওয়া দরকার। ওই এলাকার বর্ধিষ্ণু গ্রাম ব্রাহ্মণবহড়ার এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারের সন্তান। মাটির মানুষ। প্রথম যৌবনে সমাজসেবার প্রবল আকর্ষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্রাহ্মণবহড়া শাখার স্বয়ংসেবক। পরে সমাজের কাজে সঙ্ঘের প্রচারক ব্রত গ্রহণ ১৯৮৪ সালে। টানা ১৯৯০ পর্যন্ত। গ্রামের মানুষের প্রবল চাপে পঞ্চায়েতে প্রার্থী। ফরম্ ফিল আপ করেই চলে এসেছিলেন। কিছু না করেই নির্বাচিত। ছোট-বড় সবার দুধদা। বাধ্য হয়ে অঞ্চল প্রধানের দায়িত্ব নিতে হলোই। সে সময় একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ভারতীয় জনতা পার্টির বীরভূমের জেলা সম্পাদকের (সংগঠন) দায়িত্বও সামলেছেন। এখন নিজের এলাকা নিয়েই ব্যস্ত।

পশ্চিমবঙ্গে হাতে গোনা যে কয়েকটি আসনে বিজেপি তার উপস্থিতির ছাপ রেখেছে তার মধ্যে ময়ূরেশ্বর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে মাত্র দুইটি শিবিরেই দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনী রাজনীতি ঘোরাফেরা করেছে বা আটকে থেকেছে। সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসাটা যথেষ্ট কৃতিত্বের। বিগত লোকসভা নির্বাচনে 'পরিবর্তন' ঘটে গেছে। শাসক দলের পরিবর্তে তৃণমূল কংগ্রেস- কংগ্রেস জোটই এগিয়ে রয়েছে আবেগ এবং ফলাফলে। তা সত্ত্বেও বিজেপি প্রার্থী ময়ূরেশ্বর বিধানসভা ক্ষেত্রে গত লোকসভা নির্বাচনে প্রবল বাম-বিরোধী তৃণমূল-ঝড়েও ভোটের নিরীখে ২১ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বামরাজত্বে বিজেপি'র নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে। এটি কোনও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা ভাষ্যকারের পক্ষে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। একটি স্বতন্ত্র আদর্শবাদী দল হিসেবে বিজেপি'র ভোটব্যাঙ্ক তৈরি হওয়াটাও জরুরী।

পার্টি অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল।

এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারের দেওয়াল লিখনে এগিয়ে বিজেপি-ই।

এখানে ১৯৯১ সালের নির্বাচন থেকেই বিজেপি'র নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে বললে ভুল হবে না। পোলারাইজেশনের ফলে বিজেপি নির্বাচনী সাফল্য পায় নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক। বিগত লোকসভা নির্বাচনে মমতার নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং এস ইউ সি আই জোট ৪২ টির মধ্যে ২৬টি আসন দখল করে বিপুল সাফল্য পায়। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে জোটের বাইরে রাখাতে পাঁচটি আসন শাসক বামফ্রন্টের অনুকূলে যায়। কারণ, বিজেপি প্রার্থীরা পরাজয়ের ব্যবধানের থেকে অনেক বেশি ভোট পায়। এই চিরাচরিত ভোটব্যাঙ্কই বিজেপি প্রার্থীদের ভরসা। ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল এখনও পর্যন্ত প্রচারের নিরীখে এগিয়ে। সিপিএম এবং তৃণমূল তাদের প্রার্থীপদ ঠিক করলেও এখনও প্রচারে নামেইনি। এর মধ্যে দলের কর্মীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরা শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। বেশিরভাগ ভোটারদের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে আছে বলে জানালেন প্রার্থী স্বয়ং। দেওয়াল লেখার কাজ অনেকটাই সেরে ফেলেছেন। কোটাসুরে অন্য কারও দেওয়াল লিখন চোখেই পড়ল না। ময়ূরেশ্বরে মোট ভোটার ১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৩৫ জন। তার মধ্যে হিন্দু ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৩০ জন। সংখ্যালঘু ৪১,২০৫ জন। দুধকুমারবাবুর আশা তিনি প্রধান হিসেবে যে কাজ করেছেন তার নিরীখে সংখ্যালঘুদেরও প্রভূত সমর্থন পাবেন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি 'দুধকুমার'-এর ভাবমূর্তি কাজ করবে।

গত কয়েকটি নির্বাচনে দেখা গেছে ১ লক্ষের সামান্য কিছু বেশি ভোট পড়ে।

২০০৬-এর ভোটের চিত্র—
মোট ভোটার ১৩৮৫৭৫
প্রদত্ত ভোট-১০৯৪৯৩
সাধু বাগদী (সিপিএম)
-৬৬,৮১৪টি ভোট - ৬১ শতাংশ
বামপদ ভল্লা (কংগ্রেস)
-৯,১২৫টি ভোট — ৮.৩ শতাংশ
সুভাষচন্দ্র মণ্ডল (বিজেপি)
-২৯,৮১৩টি ভোট-২৭.২ শতাংশ

মোট বুথের সংখ্যা ১৮০, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বুথের সংখ্যা ২৬ টি। মিশ্র জনসংখ্যার বুথের সংখ্যা ৪১ টি। সব মিলিয়ে অ্যাডভ্যান্টেজ বিজেপি বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রার্থী নিয়ে সিপিএম এবং তৃণমূলের ভিতরে অসন্তোষ রয়েছে। তার সুবিধাও বিজেপিই পাবে। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। ইতিমধ্যে বুথ কমিটি গড়ার কাজ চলছে, পরে কর্মীসভা। বুথ অনুসারে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়ে গিয়েছে। নতুন পুরনো সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেমে পড়েছেন। প্রদেশের নেতাদেরও নজরে রয়েছে ময়ূরেশ্বর।

স্বস্তিকা
নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠান
১৪ এপ্রিল, ২০১১, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬টায়
স্থান : রামমোহন হল
প্রধান বক্তা : মাননীয় সুরেশ সোনী
সহ-সরকার্যবাহ, আর এস এস
সবাদর করি আহ্বান

প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল, '১১
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১৮ এপ্রিল, '১১
নববর্ষ সংখা - ১৪১৮
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার পূর্বে 'পরমহংসমশাই', উপহাসবাদীরা বলতো 'গ্রেটওজ'। আর হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবার পর তিনি হলেন 'ঠাকুর'। স্বামীজীর কথায় 'অবতারবরিষ্ঠ'। ঠাকুরের লীলায় বেদান্তদর্শন উপস্থাপিত হলো অন্য ব্যাখ্যায়। গৃহী আর ত্যাগী — এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত হলো এক অনন্য দর্শন। এই মহামানবের ১৭৫তম জন্মজয়ন্তীর অবসরে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন — ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।
লিখেছেন :— স্বামী আত্মবোধানন্দ, হরিপদ ভৌমিক, সঞ্জয় ভুঁইয়া, বিনায়ক সেনগুপ্ত, অমিতাভ গুহঠাকুরতা প্রমুখ।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম : দশ টাকা।।
আগামী ২ এপ্রিলের মধ্যে কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ব্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101
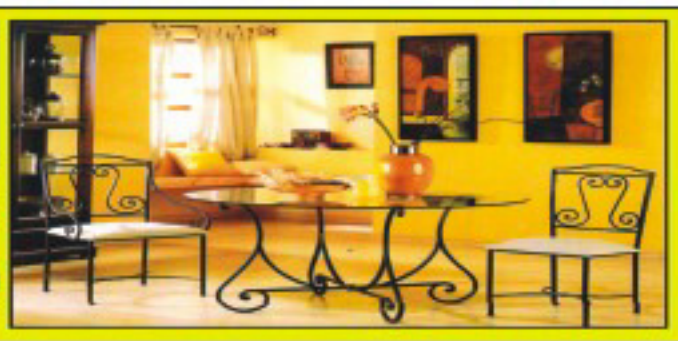

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ : সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স - ২২৪১৫৯১৫
e-mail : swastika5915@gmail.com / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com